ফোকলোর চর্চা : তত্ত্ব ও পদ্ধতি

মনিরুজ্জামান

১. 'ফোকলোর' সৃষ্টি ও বিস্তৃতি

'ফোকলোর' (Folklore) কথাটি লণ্ডনে যখন সৃষ্টি হয় (১৮৪৬-১৯৭৮), তখন (বা তার কিছু আগে থেকে অর্থাৎ উনিশ শতকের গোড়াতেই (১৮০৬ ইত্যাদি) জার্মানীতে গ্রীম ভাইদের কল্যাণে ভাষার উৎস, এলাকাভিত্তিক বৈশিষ্ট্য (আঞ্চলিক তথ্য), তুলনা এবং পরিবর্তনের প্রসঙ্গগুলি স্পষ্ট হয়ে আসছিল। তাদেরই ব্যবহৃত Volks Kunde, Volks Prache শব্দগুলি তখন থেকেই বাইরেও প্রচলিত হয়। (Volks মানে সাধারণ মানুষ বা জনগোষ্ঠীর লোক সাধারণ; Kunde অর্থ প্রযুক্তিগত জ্ঞানধারা বা জ্ঞান-কুণ্ড; prache মানে বচন বা ভাষাপ্রকার বিশেষ) এ্যাংলো স্যাকসনেরা 'ফল্‌ক্‌স' (Volks)- কে 'ফোক' বলতো বা উচ্চারণ করতো। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষার লিয়ের লেহর, লাইঅর, লীয়র, লার (যেমন প্রাচ্যভাষা সংস্কৃত বা বাংলায় 'লহর' যার অর্থ শ্রেণী, তরঙ্গ বা মালা অর্থাৎ বহুবচনবিদ্ধ কোনও বস্তু বা একটি জ্ঞানাত্মক ও সংক্রিয়াত্মক বিষয়মূল যেমন 'গীতলহর') শব্দগুলি জার্মান 'কুণ্ডে' (Kunde) শব্দটির সমার্থক ভেবে প্রাচীন ইংরেজির অপ্রচলিত-প্রায় শব্দ 'লাআর' (Laar)- -কে এই ধারণার সাথে যুক্ত করা হয় এবং বিবর্তনের ধারায় প্রাপ্ত 'লোর' (lore) শব্দটিকে ধরা হয় তার উপযুক্ত প্রতিশব্দ। সুইজারল্যান্ডেও Volchlore-এর ব্যবহার দেখা যায়। যাই হোক, শব্দটির বা শব্দ জোড়াটির এই সংকরী গঠন ((Folk + lore = Folk-lore বা Folklore উভয় ব্যবহারে) প্রায় তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা পায় এবং প্রাচীনজাতির বা পুরাতাত্ত্বিক বিষয়ের গবেষকগণ তাদের প্রকাশনাগুলিতে তা ব্যবহারও করতে থাকেন। সাধারণ্যে এই ভাবে ঐতিহ্যপ্রীতি জাগে ও ঐতিহ্যিক চিহ্নায়ক বিষয়গুলিতে আগ্রহ দেখা দেয়। প্রাচীন জনগোষ্ঠীর এই সম্পদ, যা ছিল মৌখিক এবং শ্রুতির স্মৃতিনির্ভর, তার প্রতি এই সহজাত অনুরাগ সহসাই পরিণতিতে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা ও পঠনপাঠনের স্থান গ্রহণ করে নিল; তার আগেই যদিও শুরু হয় বিবিধ গবেষণা সংস্থা গড়ার ও সভাসমিতির আয়োজনের প্রতি আন্তদেশিক ও আন্তর্জাতিক নানা উদ্যোগও। ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ ফোকলোর সোসাইটি, তাদের পত্রিকারও নামকরণ হয় 'ফোকলোর'।

এক দশকের মধ্যে এ ভাবে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও গড়ে ওঠে ইউরোপ ও আমেরিকায়, যেমন Le-Folklore (ফ্রান্স), Die-Folklore (জার্মান), Il-Folklore (ইতালি) প্রভৃতি। আরও গড়ে ওঠে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গনে American Folklore Society, ১৮৮৭ তে এবং লন্ডনে Folklore Society of London (1892) প্রভৃতিও। এগিয়ে আসেন ফরাসি নৃবিজ্ঞানী এম, মাইকেল, ইতালির উমাসিও, স্পেনের, পেড্রোফ্লোরে এবং আরও পরে ফিনিশ পদ্ধতির (ফিনল্যান্ডীয় গবেষকগণের প্রয়াস) অনুসন্ধানবিদগণ। শুরু হয় ফোকলোর গবেষণার যুগান্তকারী কর্মকাণ্ড। উপরিস্তরের আলোচনা থেকে এবং অলেখার জগৎ থেকে ক্রমে যাত্রা ঘটতে শুরু করলো গভীর তলের জগতে (deep structure), ঘটলো অনুসন্ধানের ভিন্ন পালা,- গঠনের বিন্যাস ব্যাখ্যা থেকে নানা তত্ত্বের প্রয়োগ,-উনিশ শতক থেকে আরও সামনে এবং বর্তমান সময়ে।

আসলে বিংশ শতকে এসেই মানুষ বুঝলো এ শুধু মৃত ঐতিহ্যের ধারা এবং লুপ্ত বিষয়ই নয়; এ এক চিরকেলে সক্রিয় ও আকর্ষণী বাস্তব সম্পদ। তাই আগামী কালের জ্ঞানচর্চার বিষয় হিসাবে শুরু হয় এর নব মূল্যায়ন। ক্রমে তার অন্বেষার দিকসমূহের বৃদ্ধি ঘটে এবং অধিকতর বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে ওঠে তার অনুসন্ধানের প্রক্রিয়াসমূহে। প্রথমে তার শাখা ও ধরনগুলিকে কয়েকটি প্রধান বিষয় ভাগের অধীনে সংখ্যা নির্দেশসহ চিহ্নিত করার চেষ্টা হল, নাম দেওয়া হল টাইপ (Type)। তারপর এলো গঠনরূপ (Structural forms or Organisations) ও তার এককের রূপচিহ্ন তথা মটিফ (Motif) প্রভৃতি নিয়ে যাবৎ লোকজ সৃষ্টির ধরন-ধারণের বিচার কৌশল আবিস্কারের পালা। এভাবে জন্ম নিল নৃতাত্ত্বিক জনতাত্ত্বিক (Ethnography) ও অন্যান্য সহায়ক বিদ্যার (Inter discipline গত) সহযোগে এই লোক সৃষ্টির কার্যশীলতা (functions of the elements), মিথস্ক্রিয়া (Interaction) পারিজায়িতা বা দেশান্তরণ বৈশিষ্ট্য (migratory characteristics), তুলনা (Comparative study towards establishing a proto form or Ur-text), ও লোকবিধান (formalism) প্রভৃতি বিষয়ক বিচার ও বিশ্লেষণ-জ্ঞান এবং আন্তজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র রূপে উন্নীত হয়ে এর উপাত্ত বিচারে ও প্রক্রিয়াদির প্রয়োগে ঘটলো আশাতীত প্রসার। অজানা নানা অঞ্চলের লোকজ (অজ্ঞাতপূর্ব) তথ্যও তারা আহরণ করতে থাকে। অসম্ভব কষ্ট স্বীকার ও বিপদ অগ্রাহ্য করে গড়ে তোলে বিশাল বিশাল ইন্সটিটিউট ও নানা ফাউন্ডেশন। মোটকথা 'ফোকলোর' হয়ে ওঠে উচ্চতর জ্ঞানান্বেষণ বা জ্ঞান পরিচালন ও (একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহে) পঠনপাঠন এবং গবেষণাধর্মী কার্যক্রম পরিচালনার এক কেন্দ্রিয় আধার বস্তু। এখন আমেরিকা আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে ভাবছে, 'Whether the department of Folklore is justified or it should be redefined as Folk life'.

২. উপমহাদেশে ফোকলোর সংগ্রহের প্রথম পর্যায় বা পটভূমি প্রসঙ্গ

'ফোকলোর' স্বতন্ত্র বিদ্যা হিসাবে গৃহীত হবার এবং অন্তর্গত তত্ত্বীয় ধারণাগুলি দানাবাঁধার আগে থেকেই নানা দেশে আগ্রহী জনেরা নানারকম উদ্দেশ্য ও জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনে বিষয়টার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে থাকে। প্রাচীন সম্পদ বা পুরনো কৃষি সমাজের অশিক্ষিত মুখের সৃষ্টি হিসাবে যেমন-কাহিনী, গল্প গান পালা ছোট ছোট ছড়া বা কথা ইত্যাদি ফোকলোরিক উপাদানসমূহ কষ্ট করে হলেও তাঁরা সংগ্রহ করতে শুরু করে। ব্রিটিশ ভারত এবং রাশিয়ায় এই প্রচেষ্টার সুশৃঙ্খল ইতিহাস জানা যায়। রাশিয়া ও জার্মানীতে ভারতীয় লোককাহিনীর ও সেই সাথে লিখিত সাহিত্যের (সংস্কৃত প্রভৃতি) প্রাচীন কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, জাতক-কাহিনী ইত্যাদি সংগ্রহ বা অনুবাদ প্রকাশের কথা জানা যায়। যেমন মিনায়েভিম-এর 'ইন্ডিজস্কিয়া শাজাকি লিজেন্ডি' (১৮৭৬), থিওডোর বেনফির 'পঞ্চতন্ত্র' (১৮৫৯), উনিশ শতকের শেষে কাওয়েল-এর ৬ খণ্ড জাতক কথা প্রভৃতি।

ব্রিটিশ ভারতের সিবিলিয়ান ও তাদের পরিবারের সদস্যবর্গের কীর্তি পরবর্তী ও সমসাময়িক কালের নৃতত্ত্ব-গবেষণার উপাদান জুগিয়েছিল যথেষ্ট। তাদের মধ্যে মিসেস মেরিয়ান পোস্টেনস-এর 'কচ্ছ' (গুজরাটের উত্তরাঞ্চল থেকে এই সংগ্রহ সম্ভবত আদি), মিস ফ্রেরের 'ওল্ড ডেকান ডেজ' (১৮৬৮, ১৮৮৯), গোভারের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ (১৮৭২), প্রভৃতি কাজ বিশেষ উল্লেখ্য।

অপরাপর ব্রিটিশ নাগরিকদের উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় গোটা উনিশ শতক জুড়েই,যাদের মধ্যে রয়েছেন-রবিনসন (দক্ষিণ ভারতের কাহিনী ও কবিতা ১৮২৫), এম, স্টোকস

(ভারতীয় রূপকথা ১৮৭৯), রিচার্ড টেম্পল (পাঞ্জাবি লোককথা ১৮৮৪), জেমস হিলটন নোলস (কাশ্মীরি লোককথা ১৮৮৮), এ ক্যাম্বেল (সাঁওতালি লোকগল্প, মানভূম ১৮৯১), ফ্লোরা এ্যানি স্টিল (পাঞ্জাবি লোকগল্প ১৮৯৪), যোসেফ ইয়াকবস (ভারতীয় রূপকথা ১৮৯৫), জে. ডি এ্যান্ডারসন (কাছাড়ের কাহিনী সংগ্রহ ১৮৯৫) প্রমুখ।

ভারতীয় সংগ্রাহকগণের অবদানও কম ছিল না। উনিশ শতকের দিকে সেই সংখ্যা খুব বেশি না হলেও তাঁদের কাজের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। যেমন, পণ্ডিত গঙ্গাদত্ত উপরীতা-র কাশ্মীরী প্রবাদ ও কাহিনী সংগ্রহ এক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। বাঙালি সংগ্রাহকগণের কথা স্বতন্ত্র শিরোনামে পরে আলোচিত হবে।

উনিশ শতকের ঋদ্ধ সংযোজন সত্ত্বেও এ কথা অনস্বীকার্য যে 'ফোকলোর' আন্দোলনের ফসল আমরা প্রকৃতপক্ষে দেখতে পাই বিংশ শতকে এসে। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক প্রবাহ তখন 'Back to Village' আন্দোলনের হাত ধরে এগিয়ে। কিন্তু নবযাত্রার সাথী সকলে হতে পারে নি। বহু দেশই তাতে পিছিয়ে পড়ে। যে ভারত উপমহাদেশ এক সময় ছিল ক্ষেত্রজ তথ্যের আকর ভূমি, সে তখন শূন্যহাত; তার সে তথ্য আগেই সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে বহিরাগতরা। পরবর্তী কালে উপমহাদেশবাসীদের সেই সব মৌলতথ্য বা সম্পদরাশিরই ব্যাখ্যা-তত্ত্ব কুড়াতে এখন তাদের ছুটতে হল এবং আজও ছুটতে হয় পশ্চিমের দেশগুলোতে।

৩. বিশ্বে ফোকলোর-এর ধারণার বিবর্তন: তাত্ত্বিক আলোচনার প্রসার

মহাকাব্যের যুগের শেষে মিথ কিংবা বীরোচিত [লোক] গল্পের কাহিনীর মধ্যে কিছু আকরসূত্রের (Epic Laws of Folk narrative) অবস্থান-কল্পনা একদিন সত্যি একটি প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের রূপ নিয়ে দাঁড়াল।- ১৯০৯ সালে এ্যাকসেল অলরিক পূর্ব ইউরোপের নানা বীরগাথার কাহিনী-সূত্রগুলি নিয়ে পরীক্ষা করেন। পরবর্তীতে এই সূত্র নিয়ে ও কাহিনীর এককের "পরিবর্তনশীল রূপ" ও "স্থির বা নিয়মিত রূপ" নিয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা হয়। এতে 'ফোকলোর'কে বহুভাবে অর্থাৎ অনেক দিক থেকেই আলোচনা করা সম্ভব'-এই ধারণাকে একটা তাত্ত্বিক সীমায় বাধার চেষ্টাও গড়ে ওঠে। পূর্ববর্তী তত্ত্বগুলির সীমাবদ্ধতাকেও ক্রমে চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পঠন-পাঠনের উৎসাহ থাকায় নতুন জ্ঞানতাত্ত্বিক আলোচনার ধারাটি এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ লাভ করে। সাথে সাথে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উন্নতি এবং বিকাশের ধারাটিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়। সনাতন মৌখিক (লোক-) সাহিত্য থেকে প্রভিন্ন হয় 'নব লোকসাহিত্য' (New folklore) । অর্থাৎ সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়টি এতে প্রাধান্য লাভ করে।

বলা দরকার 'সনাতন লোকসাহিত্যে' সমাজগত পরিচয়ের অধিক কিছু তথ্য লাভের সুযোগ ছিল না। সেখানে non-folk বা fake বিষয়গুলিও মিশে যেত। পোলিশ লোকসাহিত্য-বিশষেজ্ঞ C. Hernas বললেন, লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা পরিবর্তনযোগ্য, গবেষণার অগ্রগতি আর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের নববিকাশই যুগপৎ পরিস্থিতি ও পূর্ব ধারণার এই পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। আমেরিকায় এবং রাশিয়ান ব্লকে তাত্ত্বিক ধারণার প্রসার ঘটলেও (গত শতকের শেষ ৩০/৪০ বছরে যতটুকু হয়েছিল) বিষয়টা সেখানে এবং অবশিষ্ট ধরণীতেও বটে, দুই ধারাতেই লোকসাহিত্যের চর্চা হয়েছে [Folklore these days is appeared with many a theoretical models. এক, পাঠকেন্দ্রিক চর্চা (গবেষণা), যার তাত্ত্বিক নাম texto-centric approach, দুই, লোকজীবনের সর্বঅবয়বই যার লক্ষ্য,- মৌখিক সৃষ্টির (non-authoric & anonymous) ভিত্তিই প্রধান এ ক্ষেত্রে।

দুই. ফোক-ননফোকের পার্থক্যজনিত জ্ঞানের ভিত্তিতে ও author-folkloristic দৃষ্টিতে সৃষ্ট তত্ত্বের কাঠামো বা ছকের মধ্যে বন্দী রেখে লোকসাহিত্য বিচার। এ ব্যাপারে পূর্ব ইউরোপ বিশেষেত পোলান্ড ও ফিনল্যান্ডের নব্য ধারার নৃবিজ্ঞানীগণের অবদানই উল্লেখযোগ্য কিংবা অধিক প্রাসঙ্গিক। [বাংলাদেশে রবীন্দ্রধারার পঠন-পাঠন বা বিশ্লেষণ-ধারাকে আমরা প্রথম ধারারই ব্যতিক্রমী সম্প্রসারণ যদি ধরি।

কিন্তু এই দুই ধারার আলোচনায় কারা বেশি লাভবান সে বিচার আজ নিরর্থক। কারণ তত্ত্বীয় ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী ধারার অগ্রগতি সত্ত্বেও এই ধারার সমালোচনাও কম হয়নি। 'ফোকলোর'-এর অর্থ এখন প্রাচীন কোনও নাঙা সৃষ্টির আবিষ্কার ও তাত্ত্বিক আবরণে ঢেকে নিজের মাহাত্ম্য-যুক্তিকে প্রকাশ বা উপস্থাপন করা এক নতুন সত্য। সমালোচকের নিম্ন (মহেন্দ্রকুমার মিশ্র *Contemporary Folklore: From Academi domain to public sphere)* : 'Unfortunately Folklore as the intellectual property created by the folk has non-authorship when the folklorists own it. How much we really understand the totality in comparison to the creators of folklore ?' বক্তব্যটি প্রশ্নযুক্ত হওয়ার যৌক্তিকতাটা কি বাস্তবিক ফেলে দেওয়ার মত?

৪. উনিশ শতকের আলোচনা বা তত্ত্বগতবিষয়ে অবহতি

যাইহোক, আদি বা প্রারম্ভিক পর্বে গ্রীম ভ্রাতৃদ্বয়ের (১৮২২) লোকজ সন্ধানের ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং লোকসাহিত্যের গবেষণা ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। তেমনি অন্যান্য উদ্ভাবকগণের আবিভাবের (১৮২৬ প্রভৃতি) কথাও জানা যায়, তবে তাঁদের কাল ও বিশেষ তত্ত্বের গুরুত্ব ঐতিহাসিক ক্রম বিচারে নির্দিষ্ট থাকে নি। তবু ই.বি. টেইলর, কার্ল ক্রোন, এন্টি আর্নে থিওডোর বেনফের নাম এভাবেই উল্লিখিত হয়ে থাকে। এঁদের কেউ কেউ ভারতীয় লোকতথ্য সংগ্রহ বা বিশ্লেষণের সাথেও জড়িত হন। তাঁদের বিশ্লেষণ থেকে নিম্ন তত্ত্বসমূহের কথা জানা যায়।

[১] কাহিনীর ভ্রমণশীলতার ধারণা ও 'ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব'

য়াকব লুডউইগ কার্ল গ্রিম এবং উইলহেলম গ্রিম দুই ভাই লোককাহিনী সংগ্রহের মানসে উত্তর জার্মানি (High German) ও দক্ষিণ জার্মানি (Low German) ভাষাভাষীর থেকে একই ধরনের উপাত্ত সংগ্রহ করেন ও পরে বিশ্লেষণ করেন। প্রথমে দুখণ্ডে শিশুদের জন্য কাহিনীগুলি প্রকাশ করেন উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে (১৮১২-১৫)। হ্যান্স-ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের বা আমেরিকার মাদার গুজ স্টোরিজের আদি প্রেরণাস্থল ছিল এই দুটি বই। গ্রিম ভ্রাতৃদ্বয় পরে অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন এতে একই দেশের দুই অংশের ভাষায় ধ্বনিগত পার্থক্য রয়েছে এবং পার্থক্যসমূহ ইতঃস্তত বা এলোমেলোও নয়। গভীরভাবে অবলোকনের কারণে তাঁদেরকে একটা পদ্ধতি বের করতে হয় যার নাম 'তৌলন পদ্ধতি'। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাঁরা 'ভাষা পরিবর্তনের' যে 'নিয়মিত' ধারা আবিস্কার করেন তা ঐতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করে। তাঁরা এও উপলব্ধি করেন যে আর্য (ইন্দো-ইউরোপীয়) জনগোষ্ঠী পরিভ্রমণ করায় তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে মৌখিকভাবে তাদের সৃষ্ট কাহিনীগুলিরও স্থানান্ত র ঘটেছে। তারা বুঝলেন, কাহিনীগুলি স্থানভেদে নাম ও কাহিনীর অংশ বা উপঅংশভাগে বিবর্তন ঘটলেও এগুলির উৎস এক এবং সেটাই মূল; পদ্ধতিগতভাবে যার পুনর্গঠন সম্ভব। হোমারের কাহিনী ও ভারতীয় মহাকাব্যের কাহিনীর সাদৃশ্য থেকেই সে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। এই আবিষ্কার কয়েকটি মতবাদ ও তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা দেয়। সেগুলির একত্র নাম, 'ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্ব'। আর্যদের পারিজায়ী চারিত্র্যের কারণে এই তত্ত্বের বাস্তবতা স্বীকৃত হয়।

[১ ক] ঃ 'একউৎস তত্ত্ব'

ভাষার ক্ষেত্রে যেমন এক উৎসক (Uni-genesis) তত্ত্ব ও বহু উৎসক (poli-genesis) তত্ত্ব আছে (প্রায় একই সময় থেকে সৃষ্ট ঐতিহাসিক-ভাষাতাত্ত্বিক তত্ত্ব), তেমনি লোক কাহিনীর ক্ষেত্রেও ভ্রাম্যমান আর্যদের থেকে একই গল্প নানা স্থানে নানা রূপ গ্রহণ করেছে। গ্রীক পুরাণে ট্রয়নগরে প্রায়ামের হেলেন অপহরণ ও ভারতীয় পুরাণে লঙ্কাপুরীতে সীতাহরণ একটি তুলনীয় উদাহরণ। এর থেকেই এই সৃষ্টি বৈচিত্র্যকে অন্তর্গত লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য বিচারে এক উৎসক সৃষ্টি বলা হয়। লোক কাহিনী জটিল হলেও মূল প্রত্ন-কাহিনীটি (হারিয়ে গেলেও) এই তত্ত্বে পুনর্গঠন-যোগ্য ভাবা যায়।

[১ খ] পুরাণের 'ভগ্নাংশ মতবাদ'

লোক কাহিনী ব্যতীত পুরাণের অংশ ভেঙ্গে একই প্রক্রিয়ায় ভিন্ন কোনও স্বাধীন কাহিনীরও উদ্ভব সম্ভব। এইরূপে স্বাধীনভাবে সৃষ্ট ('পুনরুদ্ভব-জাত') কাহিনী আসলে ভাগ্নজাত পুরাণ বা বহুভগ্নজাত এক প্রত্ন-পুরাণেরই অংশ বিশেষ। ইন্দো-ইউরোপীয় কাহিনী তুলনারই এটি একটি প্রক্রিয়া। অন্য অর্থে গ্রীমদের ইন্দোইউরোপীয় তত্ত্বেরই এটি এক অংশ।

৫. বিংশ শতকর অগ্রগতি

[৫ক.] ফিনল্যান্ডের ক্রোহন-পরিবারের অবদান ('ফিনিশীয় পদ্ধতি')

মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি উভয়েরই পরিবর্তন-বিবর্তন মূলে আছে ভৌগোলিক ভাবে মানবজাতির বিস্তার। মানুষের জীবন-জীবিকা পরিচালনার মধ্যে আরণ্য ও পরে কৃষিজীবনের ইতিহাস যুক্ত। তার ভৌগোলিক বা স্থানগত অবস্থান ও পরিবেশের সাথে তার সংস্কৃতিরও সম্পর্ক। এই পরিভ্রমণশীলতা (প্রধানত ফলমূল কিছু শস্য এবং শিকার ও পশু খাদ্যের সন্ধানে) ও স্থানিকতাই (ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ) সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার জন্য দায়ী।

ঐতিহাসিক দৃষ্টির সাথে ভৌগোলিক দৃষ্টিকে যুক্ত করে লোকসংস্কৃতির বিকাশের ও বিভিন্নতা সৃষ্টির কারণ নির্ণয়ের চেষ্টাটি আপাত নব্য প্রয়াস। এর থেকেই জন্ম নেয় নতুন একটি মিশ্র ধারণা বা তত্ত্ব, তাকেই বলে 'ফিনিশীয় পদ্ধতি' এবং তারই নাম 'ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক তত্ত্ব'।

ধারণাটি কোনও ক্রোন বা ক্রোহ্ন পরিবারের (Krohn) পিতাপুত্রের উদ্ভাবিত ও প্রতিস্থাপিত হলেও এটা ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ত্বের মতই বা তত্ত্বেরই সমান্তরাল ও সমভাবাত্মক। তবে এই দুয়ে প্রভেদ আছে। প্রথমত এই তত্ত্ব প্রকৃতিতে মিশ্র। এবং সেটি কেবল ইতিহাস ও ভূগোলে স্থানকালের বিষয় হয়েই থাকে নি, এই তত্ত্বের মধ্যে ইতিহাস-তত্ত্ব ও ভৌগোলিক জ্ঞানের সাথে সাথে ভাষাতত্ত্ব, পরিবেশ তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব বা জনতত্ত্ব (সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের পঠন-পাঠনের বৈশিষ্ট্যলব্ধ) প্রভৃতি বহুবিদ্যক ধারণাযুক্ত চিন্তা বা আন্তবিদ্যক ধারণাগুলিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ফিনল্যান্ডের হেলসিংকী অঞ্চলের সমাজবিজ্ঞানী জুলিয়ান ক্রোহ্ন প্রথম বিষয়টিতে জোর দেন। পরে তার পুত্র কার্ল ক্রোন (Krohn) ১৯২৬ সালে এ তত্ত্বের মধ্যে পূর্ণতা আনেন। মানুষ যতই স্থান থেকে স্থানান্তরে ছড়িয়েছে- খাদ্য, সম্পদ বা যুদ্ধের প্রয়োজনে- তার সংস্কৃতিরও ততই প্রসারণ (diffusion) ও সম্মিলন (acculturation) ঘটেছে সেই সাথে এবং বিচিত্রতর রূপে। ক্রোন পরিবারের এই দুই সদস্যের কৃতিত্ব কেবল এই তত্ত্ব উদ্ভাবনেই নয়, তাঁরা ব্যবহারিক ভাবেও এর সমৃদ্ধি ঘটান এবং একটা ঐতিহ্য সম্পৃক্ত সত্যকেও প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা ইতিহাস অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় ফিনল্যান্ডের একটি অতীত ও

প্রায় লুপ্ত বীর-গাথা ('কালেভালা')-র রূপান্তরগুলি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে সেগুলিকে মেলাবার চেষ্টা করেন। তাতে বিভিন্নভাবে প্রাপ্ত কাহিনীটির এই সব ধারণকৃত অংশ বা উপাদানের মধ্যে তাঁরা অতীতে জনগোষ্ঠীর পরিভ্রমণের তথ্যের সাথে যেমন মিল খুঁজে পান, তেমনি কিছু অংশে অমিল বা অজ্ঞাতপূর্ব বৈশিষ্ট্যকেও সুশৃঙ্খলভাবে লক্ষ্য করেন। এই সব অংশকে তাঁরা মূল কাহিনীর দেশীয় রূপাংশ বা উপাদান-একক এবং অপরিচিত তথা বিদেশীয় (অর্থাৎ বহিরাগত) রূপাংশ বলে আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতেও সক্ষম হন। প্রথম এককগুলিকে তাঁরা বলেন এমিক (emic) ও দ্বিতীয় এককগুলিকে বলেন এটিক (etic) । এদের ক্রিয়াশীলতা ও ভাষিক গঠনকেও স্বতন্ত্র বলে তাঁরা নির্দেশ করেন (দ্র. মনিরুজ্জামান ২০০২ ঃ ৩৯)। রূপান্তরগুলি (Oikotype) থেকে মূল কাহিনী পুনর্গঠনে ও বহিরোপাদানগুলি বাছাই করে বাদ দেওয়ার কাজে এই এমিক-এটিক ধারণা ও একক নির্ণয় পদ্ধতিটি যথার্থই সহায়ক প্রমাণিত হয়। পুনর্গঠিত রূপটি থেকে আদি রূপ ('আদিম পাঠ' বা Archetype)-এর ধারণা করা যায় বা তাকে মূলপাঠের (Ur-form) মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

[৫ খ] টাইপ ও মটিফটাইপ প্রসঙ্গে

ফিনিশীয় পদ্ধতিরই একটি শ্রমশীল কাজ গল্পের উপাদান ও ধরন নির্ণয়। হেলসিংকী, কোপেন হেগেন প্রভৃতি স্থানের লোকসাহিত্যবিদগণ এই চিন্তা ও পদ্ধতির উদ্ভাবক। শেষে এন্টিআর্নে এগুলি ৮টি পর্বে সাজিয়ে যান। ১৯২৬-২৭-এ টমসন এই সূচির সংশোধন করেন। এটাই টাইপ তত্ত্ব। লোকগল্প প্রকারের (কোন ধরণের বা কার ও কিসের গল্প ইত্যাদি) সূচি ও উপসূচি নির্মাণের দুটি ধরন হচ্ছে-১- কাহিনীগুলির শ্রেণী নির্ণয় করা, ২. প্রত্যেক শ্রেণী বা উপশ্রেণীর কাহিনীর মধ্যে বৈশিষ্ট্যের চিহ্নগুলি (যেমন যাদু, অভিশাপগ্রস্ততা, অলৌকিকতা, টাবু ইত্যাদি) নির্দেশ করা। টাইপগুলি সংখ্যা দিয়ে বুঝানো হয় এবং ভাগ করা হয়, যেমন ১ থেকে ১ কম ৩০০ হচ্ছে একটা গল্পের ২৯৯ রকম বৈচিত্র্য, আবার ৩০০ থেকে ১ কম ১২০০ হচ্ছে আরেক রকম গল্পর অন্তর্গত নয়শত বৈচিত্র্য, ইত্যাদি। এভাবে পাঁচটি গল্প-ভাগের রকম হচ্ছে ১। জীবজন্তুর কাহিনী যার টাইপ পাওয়া যায় বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম এবং সেগুলি গ্রন্থবিজ্ঞানের ডিউ প্রণালীতে ভাগ করা হয়েছে ১-২৯৯; ২। সাধারণ কাহিনী (যার টাইপ বা ধারাগুলি ৩০০ সংখ্যা দিয়ে শুরু) ৩। হাস্য কৌতুক ধরনের মজার গল্প (যার নম্বর ১২০০ থেকে ধরা হয়); ৪। শিকলী গল্প বা Chain story (একে মালা-গল্প বলা যায় যেখানে বহু উপগল্প এক সূত্রে বাধা এবং এগুলি ২০০০ নম্বর থেকে শুরু); ৫। আর সর্বশেষ গল্প শ্রেণী আসলে সেগুলি বিবিধ ধরনের ও অশ্রেণীভুক্ত। এগুলির নম্বর চিহ্ন হল ২৪০০-২৪৯৯।

লক্ষযোগ্য যে, সবশ্রেণীর গল্পের সংখ্যা বেজোড় সংখ্যায় ও কোনও শত বা সহস্রবাচক প্রান্ত বা সমাপনী সংখ্যা থেকে ১ কম সংখ্যায় শেষ হয়। এই তালিকা বাড়ানো অসম্ভব নয়। তবে গল্পটা কি রূপ নেবে সেটাই প্রধান কথা। সেটা আবার বিশেষ দেশের বিশেষ সমাজের ওপর নির্ভরশীল। তাই এই সংখ্যা এ সমাজেরও সংখ্যা-চিহ্ন। কারণ 'সমাজই টাইপ নিয়ন্ত্রণ করে।' একই সংখ্যার গল্পে মটিফ-চিহ্ন ভিন্নতর হলে তা ('মটিফ' নম্বর) দশমিক যুক্ত সংখ্যায় ভেঙ্গে যাবে। যেমন, ৬৩২ এবং ৬৩২.১ ইত্যাদি (দ্র. *লোকসাহিত্যের ভিতর ও বাহির* ২য় সং. পৃ. ৪১-৪৫)।

মটিফসমূহ সংখ্যার পূর্বে অক্ষর দ্বারা বিন্যস্ত। সেগুলি রোমান লিপির অক্ষর (alphabet) তালিকার A থেকে Z পর্যন্ত ২৩টি বর্গে বিস্তৃত (I O Y ব্যাতিরেকে) যেমন

পুরাণের মটিফ ব্যবহৃত হলে তা `A' শ্রেণীভুক্ত হবে যার উপশ্রেণী ১ কম ২৮০০ অর্থাৎ A-0 থেকে A-2799 পর্যন্ত। টাবু (Tabu)র মটিফ হলে তার চিহ্ন হবে C-0 থেকে C-999 পর্যন্ত ইত্যাদি। টাইপে ১ সংখ্যাকে সূচনা সংখ্যা হিসাবে ধরা হয়, মটিফে প্রত্যেক অক্ষরগত বিন্যাসটি শূণ্য থেকে শুরু হয়, কিন্তু শেষটা টাইপ-সূচকের মত পূর্ণ সংখ্যা থেকে ১ কম। এই তালিকাগুলি বিশাল।

[৫ গ] রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এককের বিন্যাস প্রক্রিয়া

ভূ এবং জীববিদ্যা থেকে আহৃত শব্দ MORPH কে ভাষাতত্ত্বে ব্যবহারবাদী ও সংগঠনবাদীগণ প্রথম ব্যবহার করেন। চমস্কি এই তত্ত্বকে পরিবর্তিত ভাবে সৃষ্টিশীল রূপান্তরবাদের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বিপ্লব সাধন করেন। রোমান য়াকবসন এবং চমস্কি নৃবিজ্ঞানের ওপরও প্রভাব ফেলেন, বিশেষত লেভাই স্ট্রাউস তাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। অন্যদিকে রাশিয়াতে লোককাহিনীর মধ্যে চরিত্র ও তার কার্যাবলী (ঘটনা সংস্থান) লক্ষ্য করে নতুন এক ধারণার সৃষ্টি করা হয় যে, গল্পে চরিত্রের বদল হয় কিন্তু সমধর্মী কাহিনীগুলিতে সম্পাদিত ক্রিয়াগুলি থাকে সদৃশমূলক। ফলে এই 'ক্রিয়াশীলতা'র সদৃশতার ভিত্তিতে কাহিনীর type-ও নির্দশ করা সম্ভব। পূর্বসূরীদের আলোচনাকে আরও এগিয়ে নিয়ে ও স্বকীয় ধারণাতে যুক্ত করে ভ্লাদিমির প্রপ গত শতকের বিশ দশকে তাঁর কাহিনীর রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণটি কাহিনীর উপাদান ও তাদের সম্পাদিত কার্যাবলীর তথা ক্রিয়াশীলতার সদৃশ্যতা ভিত্তিতে ৩১টি ভাগে এককের (ব্লক–) গঠন চিহ্নিত করেন এবং বাক্যে কর্তাকর্ম ক্রিয়ার সমাবেশ রীতিতে (Syntagmatic) বা ধারায় সেগুলিকে সম্পর্কিত করেন। যে গ্রন্থে তিনি এই রীতির কথা বলেন তার নাম Morpholagya Skazkie; ১৯২৮ সালে তা প্রকাশিত হয়। কিন্তু রুশ ভাষায় প্রকাশিত হওয়ায় স্ট্রাউস তা জানতে পারেন নি। ৩০ বছর পর (১৯৫৮) বইটির অনুবাদ বের হয়। তখনই পপ বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেন এবং ফোকলোর আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন ধারারও সৃষ্টি হয়। (দ্রষ্টব্য, *লোকসাহিত্যের ভিতর ও বাহির*, ২০০২ঃ ৪৫-৪৮ পৃষ্ঠা)।

অন্যদিকে ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয় আমেরিকা প্রবাসী স্ট্রাউসের পুরাণের সংগঠন বিশ্লেষণের গ্রন্থটি (Structural study of Myth) এ গ্রন্থে ভাষাতত্ত্বের আদর্শে তিনি Myth বা পুরাণ কাহিনীকে বিশ্লিষ্ট করেন। 'ফোনিম' এর মত 'মিথিম' (Mytheme) এর ধারণা সৃষ্টি করে নিয়ে একক নির্ণয় করেন তিনি পুরাণাংশমূহের ভিত্তিতে এবং সেগুলিকে গুচ্ছ বিন্যাসে সজ্জিত করেন-phoneme familyর সমান্তরালে। (K. L. Pike এর বিখ্যাত ধ্বনিতত্ত্ব আলোচনাও ছিল এই আদর্শেরই: ১৯৪৩-১৯৪৮। বিস্তৃত দ্রষ্টব্য, *'লোক-সাহিত্যের ভিতর ও বাহির'* ২০০২ঃ ৪৮-৪৯ এবং ২০৫-২০৭ পৃ.)। চমস্কি স্ট্রাউসের মডেলের একটি আলোচনা প্রকাশ করে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

৬. বাংলাদেশ পরিস্থিতি : পূর্বকথন

(ফোকলোর থেকে লোকলোর তথা পূর্বপদ-পরপদের সংকরায়ন)

আমাদের দেশে প্রথমে (শুরুর দিকে বিদেশীদের হাতে) উপাত্ত সংগ্রহ, তার পুনঃকথন (retold) এবং সাধারণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়েই শুরু হয় ফোকলোর চর্চা। আসলে তা ভারতীয় ফোকলোর অনুসন্ধান-তৎপরতার (তখনও শব্দটি এদেশে চালু হয়নি) বা সেই ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক ক্রিয়াকাণ্ডের অংশরূপেই এর যাত্রা শুরু। (ভারতীয়দের তৎপরতার প্রসঙ্গ, দ্রষ্টব্য ২নং আলোচনাংশ)

পশ্চিমী 'ফোকলোর' শব্দের সাথে পরিচিত হওয়ার পর এই শব্দের বঙ্গীকরণের প্রচেষ্টা শুরু হয় বিংশ শতকে এসে। এখানেও দেখা দেয় সংকরীকরণের প্রবণতা। ফোকলোরকে মোটামুটি 'লোক' শব্দের প্রতিরূপে গ্রহণ করা গেলেও আরও বহু প্রতিশব্দ এই সাথে প্রস্তাবিত হয়। জোড়-শব্দের শেষাংশেরও গড়ে উঠে বহুতর অন্ত্যনাম। এই ভাবে লোক+সাহিত্য, লোক+সংস্কৃতি কিংবা পল্লী বা কৃষক+সাহিত্য, জনপদ+সংস্কৃতি ইত্যাদিভাবে এগুলি পরি পুঞ্জিত হয়। অর্থাৎ দেখা যায় এই শব্দটির পূর্বপদ হিসাবে প্যারাডাইম রচিত হল লোক ছাড়াও গ্রাম, কৃষক, গণ, জন, পল্লী এবং আরও নানা শব্দরূপ এবং পরপদ হিসাবেও তেমনি এলো 'সাহিত্য' তো আছেই, তাছাড়া আরও যুক্ত হলো তত্ত্ব, জ্ঞান, যান, চারণ, কৃতি, কলা, চর্যা, বৃত্তি, শ্রুতি, সংস্কৃতি, শিল্প, রূপ ইত্যাদি ইত্যাদি। মোট কথা দাঁড়ালো 'লোক'- এর যে কোনও বিকল্প শব্দের সাথে 'সাহিত্য' বা 'সংস্কৃতি' প্রভৃতির বিকল্প জুড়ে হল সংকরায়ন-সম্ভব যে কোনও তৃতীয় শব্দ। এসব ছাড়াও দেশজ, লোকজ, লোকায়ন, লোকায়ত, প্রভৃতিরও ব্যবহার দেখা গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অখণ্ড বা দ্বিখণ্ড কোনও শব্দেই সন্তুষ্ট হতে পারেননি কেউই। অনেকে ইংরেজি শব্দটাকেই মেনে নিয়ে কিংবা অপরাংশ 'লোর' কথাটি রেখে দিয়ে এই বিতর্কের অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। 'লোর' কথাটি বাংলায় 'অশ্রু' অর্থেই প্রধানত ব্যবহৃত হয়- যেমন 'আঁখি লোর'। তথাপি মযহারুল ইসলাম তাঁর গ্রন্থনামে এই শব্দ ব্যবহার করেন- আন্তর্জাতিক শব্দের সমান্তরালতার যুক্তিতে। ফোকলোর-চর্চা ও গবেষণার লক্ষে এ দেশে যে সব সংস্থা গড়ে ওঠে তাতেও মিশ্রভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়, যথা. ফোকলোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ, বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি, লোকসাহিত্য গবেষণা-কেন্দ্র, লোকসাহিত্য সংগ্রহ সমিতি, জালালাবাদ লোকসাহিত্য পরিষদ, লোকসংস্কৃতি-চর্চা কেন্দ্র, ফোকলোর গবেষণা সংসদ, পল্লী সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি (দ্র. *লোকসাহিত্যের ভিতর ও বাহির*, ২য় সংস্করণ ২০০২ঃ ৬৬-৬৭)।

যাইহোক, এই গ্রাম পল্লী বা লোকজগৎ যার সম্বন্ধে বাঙালির আজকের আগ্রহ তা কিন্তু বাংলারই চিরন্তন লোকজগৎ; অথচ তার সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকে খুলে দিল বাইরের লোক! এই অর্থেই এই বাংলা-লোকজগৎ মূলত ভারতীয় লোকজগৎ আবিষ্কারজনিত কর্মকাণ্ডের বাইরে নয়,-বরং সেই অনুপ্রেরণাতেই বাংলাদেশের সিবিলিয়নদের পাশাপাশি বাঙালি সংগ্রাহকগণও প্রোৎসাহিত হন। ভারতীয় লোকউপাদান সংগ্রহের বিষয়টা প্রথম থেকেই ছিল ব্যক্তিগত প্রয়াসে সীমিত। তথাপি তার বৈচিত্র্যগত অবদান বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। বঙ্গীয় ফোকলোর-চর্চার মধ্যে তাই একটা বিস্তৃতিও ঘটে। সে তথ্যের সামান্য উল্লেখ এখানে অসঙ্গত নয়।

৭. বাংলা ফোকলোর চর্চার প্রারম্ভিক ধারাসমূহ

বাংলা লোকজগৎ আবিষ্কারে সিলিয়নগণের আগ্রহ ছিল বরাবরই। মূল ভূখণ্ডের (পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ) তো বটেই উভয়বঙ্গের পার্বত্য এলাকাগুলিরও লোকতথ্য সংগ্রহে তাদের ছিল সমান আগ্রহ।

ব্রিটিশ-ভারতের সিবিলিয়ন ও মিশনারীর সদস্যবর্গের কীর্তি পরবর্তী বা উল্লিখিত কালের নৃতত্ত্ব গবেষণারও উপাদান জুগিয়েছিলো। যোগ্যতার সঙ্গেই তাঁরা তা সম্পন্ন করেন। এঁদের মধ্যে উইলিয়াম ম্যাক কুলক (বাঙালি গার্হস্থ্য গল্প ১৮১২), মর্টন (১৮৩২) ও জেমস লঙ-এর (১৮৬৮) বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ, গ্রীয়ারসনের মানিকচাঁদের গান (১৮৭৩) বিশেষ উল্লেখ্য। মনে রাখতে হবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের (উইলিয়াম কেরীর 'কথোপকথন' প্রভৃতি

১৮০১) এবং পরবর্তী কালে এশিয়াটিক সোসাইটির অবদানও কম ছিল না এ ক্ষেত্রে। এই সময় কিছু কিছু পত্রিকাকেও অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা যায়। 'অরুণোদয়' পত্রিকার ১৮৫৭ সালের সংখ্যাগুলি তার সাক্ষ্য দেয়।

বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং প্রতিযোগিতার আয়োজন করেও লোকতথ্য সংগ্রহ করা হতো বা সংগ্রহ ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করা হতো। উত্তর পাড়ার জমিদারের এই রূপ উদ্যোগের ফলেই লালবিহারী দের আত্মপ্রকাশ ঘটে, তাঁর পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা 'গোবিন্দ সামন্ত'র কাহিনীর (১৮৭২) মধ্য দিয়ে। পরে তিনি Folk tales of Bengal (১৮৮৩) লিখে আরও বিখ্যাত হন। বাংলা লোকগল্পের ভাগ্যে বলা চলে আন্তর্জাতিক খ্যাতিও এইভাবে অর্জিত হয় তাঁরই হাত দিয়ে। সমসাময়িক কালে রাজনারায়ণ বসুর 'গ্রাম্য উপাখ্যান' (১৮৮৩)-এর কথাও এখানে উল্লেখ্য। বিংশ শতকে বাঙালিদের অবদান আরও বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশদের মধ্যে যেমন ছিলেন গার্ডন (১৯০৭), বোম্পাস (১৯১৪), হাটন (১৯১৪), ব্রাডলি বার্ট (১৯২০) বোডিং (১৯২৫) প্রমুখ ও তাদের ক্লাসিকাল অবদানসমূহ, বাঙালি গবেষকগণের মধ্যেও তেমনি এগিয়ে এসেছিলেন রামসত্য মুখোপাধ্যায় (১৯০৪) কাশীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (পপুলার টেলস অব বেঙ্গল ১৯০৫), শোভনা দেবী (ওরিয়েন্টাল পার্লস ১৯১৫), দীনেশ সেন (ফোক লিটারেচার অব বেঙ্গল ১৯২০), শরৎচন্দ্র রায় (বীর হোর, রাঁচি ঃ ১৯২৫) এবং আরও অনেকে।

এই সব সংগ্রহের ভাষা ছিল ইংরেজি এবং রচিত হয়েছিল বিদেশীদের মনোরঞ্জন এবং বাংলা সম্পদের প্রচারার্থ। বিদেশী ভাষায় রচিত হওয়ায় তা বাঙলা ভাষা-ভাষীদের কাছে পৌঁছতে বিলম্ব হয়েছিল। তবে জানা যায় লাল বিহারী দে ১৮৫৭ সাল থেকেই লোকগল্প সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলেন। একই ভাবে গাজী কালু চম্পা ও আরও শত কাহিনীর বটতলা-প্রকাশনাগুলিও এখানে উল্লেখ্য। এগুলির ব্যতিক্রম ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দের জনৈক পণ্ডিত হৃদয়লাল দত্ত সংগৃহীত 'সঙ্গীত সংগ্রহ' (বাউলের গান)। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থটির একটি সমালোচনাও লেখেন- 'বাংলা ভাব ও ভাবের ভাষা' নামে (ভারতী বৈশাখ ১২৯০)। ধারণা করা হয় রবীন্দ্রনাথের প্রস্তুতি ছিল আরও আগে থেকেই। বস্তুত বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় রবীন্দ্রনাথের প্রয়াসে এবং সেই সাথে নতুন ভাবে সংগ্রহ ও গবেষণার ধারাও সৃষ্টি হয় কবি-সম্পৃক্ত পত্রিকাগুলিতে, বিশেষভাবে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতাও প্রায় একই সঙ্গে এই চর্চাকে আরও প্রসারিত করতে সহায়তা করে।

রবীন্দ্রনাথ দ্বারা অনুপ্রাণিত হন মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এমন কি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও সুশীল কুমার দে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীনেশচন্দ্র সেন রায়বাহাদুর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন; ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-র কাজ অগ্রসর হতে না পারলেও অধ্যাপক (কবি) জসিমউদদীন এবং আশরাফ সিদ্দিকীর (এবং উল্লেখ আবশ্যক যে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যেরও গবেষণার শুরু এবং ডিগ্রি অর্জন হয় এখানেই) আত্মপ্রকাশ সহজতর হয়।

বাংলাদেশে লোকসাহিত্য সংগ্রহের কাজ আগে শুরু হলেও (যেমন সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহ বা 'হারামণি'র সংস্করণসমূহ কিংবা সুশীল কুমারের 'বাংলা প্রবাদ' প্রভৃতি তা পশ্চিমবঙ্গেই প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী কাজের প্রকাশ ঘটে বিলম্বে। বাংলা লোকসাহিত্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে এটিকে বলা যেতে পারে দ্বিতীয় পর্ব। বস্তুত প্রথম পর্বটি যেমন ছিল

সিবিলিয়ানদের প্রেরণাজাত, দ্বিতীয় পর্বটি তেমনি ছিল রবীন্দ্র প্রভাবিত। সাধনা এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় এর সূচনা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এর একটি পরিণতি লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্র পরবর্তী ধারাটিরও সূচনা ঘটে একই সাথে। কিন্তু মৌখিক সৃষ্টির রসাবেশ ও চিরন্তনতার যে মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথের (এবং পাশাপাশি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, অবনীন্দ্রনাথ ও দীনেশ সেনের ব্যতিক্রমী উদাহরণ এখানেই উল্লেখ্য) হাতে হয়েছিল পরবর্তী কালে সে আদর্শ অনুসরণ করা কারও পক্ষেই সম্ভব হয় নি। কেননা লোকসমাজের মৌখ-সাহিত্যের মধ্যে বিরাজমান সারল্য-ভাবিত কাব্যরস, স্বভাবসিদ্ধ রসবোধ ও হাস্যকৌতুকের অনাবিল প্রকাশ ও সর্বোপরি মানবিক আবেদন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুসারীদের যেভাবে আপ্লুত ও বিভাস্বিত করেছিল তা' তাঁদের রচনাকে করেছিল রসস্রোতা, তাঁদের বিজ্ঞানী বিশ্লেষণ (ত্রিবেদী) ও সমাজগত বর্ণনাকেও (দীনেশ সেন) করে তুলেছিল মনোহর; এক কথায় তা ছিল বিরল অভিজ্ঞতার বিস্ময়কর অভিব্যক্তি।

রসবিচারের পরেই আসে বস্তু বিচারের পালা। ক্লাসিকাল পর্বান্তে এই তৃতীয় পর্বটি গড়ে ওঠে পরিশ্রমী মাঠকর্মীদের ইতিহাস সৃষ্টিকারী ধারা রূপে। এদের লক্ষ্য যেমন ভিন্ন, বিশ্লেষণধারাও তেমনি অন্যতর। এই ধারার সাথে পরবর্তী (৪র্থ পর্ব) স্রোতের মিল পাওয়া যাবে আন্ত:বিদ্যক পঠনপাঠনের সূচনা সৃষ্টির মধ্যে। বস্তুত তৃতীয় ধারা থেকেই রসতাত্ত্বিক আলোচনা বিকল্প স্থান নিতে থাকে বিশ্লেষণ ও তত্ত্বরসের গভীর কর্ষণে। রবীন্দ্র পরবর্তী তত্ত্বীয় ধারাটি সৃষ্টি হয় পশ্চিমবঙ্গে। উপন্দ্রেনাথ ভট্টাচার্য, আশুতোষ ভট্টাচার্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্কর সেন, বরণকুমার চক্রবর্তী, সনৎকুমার মিত্র, ভবতারণ দত্ত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, সুধীরকুমার করণ, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অনিমেষ পাল, শীলা বসাক, প্রমুখ সবাই তথ্য এবং তত্ত্বমুখী।

যাই হোক, বিশুদ্ধ তত্ত্বীয় ধারাটি প্রাধানত বাংলাদেশেই বিকাশ লাভ করে। তবে তা বিগত শতকের ষাট দশকের মধ্যপর্বের ঘটনা। তার আগে এবং সমকালেও সনাতন ধারার প্রবাহটিই ছিল বলবৎ।

৮. বাংলাদেশ এখন

পূর্ব আলোচনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বাংলাদেশে সনাতন আলোচনা এবং বিজ্ঞানমনস্ক ও একাডেমিক আলোচনা দুভাবেই শুরু হয় ফোকলোর বা লোকসাহিত্যের সন্ধান ও পঠন-পাঠন। এখানে উল্লেখ্য ফোকলোর চর্চার বিষয় বা দিক আসলে দুটি Formalised folklore (FF) বা বিশুদ্ধ লোকসাহিত্য এবং Materialised folklore (MF) বা লোকশিল্প ও সংস্কৃতি। কিন্তু আমাদের দেশে লোকসাহিত্যের ধারাটিই পূর্ববর্ণিত পটভূমির কারণে ও বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা বা একাডেমীর সহায়তায় একটা সহজ গতি লাভ করে। সেই ভাবে লোকসংস্কৃতির ধারাটিকে এগিয়ে যেতে দেখা যায় না। তবে ব্যক্তিগত প্রয়াসে এ ধারারও একটি প্রশংসনীয় অবস্থান আমরা লক্ষ্য করি অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ, মোহাম্মদ হানিফ পাঠান, দেওয়ান মুর্তজা আলী প্রমুখের শিল্পকৃতির সংগ্রহ এবং বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (বাংলাদেশের লোকশিল্প ১৯৮২), মোহাম্মদ শাহজালাল (বাংলাদেশের মৃৎশিল্প ১৯৮৫), মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন (কুটির শিল্প ১৯৮৫), মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ, আলমগীর জলীল প্রমুখের আলোচনায়। এছাড়া লোকসাহিত্যের (সংস্কৃতির) ক্রিয়াত্মক দিকগুলি নিয়ে (নৃত্য, খেলা, প্রভৃতি) এবং হস্ত ও কারুশিল্পাদির

বিষয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং মুহম্মদ আবদুল হাই (যৌথ) -এর আলোচনাও বিষয়টিকে ঋদ্ধ করে। সোনারগাঁও লোকশিল্প উন্নয়ন সংস্থা, শিল্পকলা একাডেমী প্রভৃতি সংস্থার কিছু প্রকাশনাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় লোকসাহিত্য (FF)। লোকসাহিত্যের পঠনপাঠন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন গবষণা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিতেই বৃদ্ধি পায় সে কথা আগে বলা হয়েছে। আসলে ব্যক্তিগত প্রয়াস (মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন থেকে আশরাফ সিদ্দিকী প্রমুখ) সোসাইটাল বা সম্মিলিত পরিকল্পনা (কুষ্টিয়ার অধ্যক্ষ আনোয়ারুল করীম, অধ্যাপক আবুল আহসান চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন লোকসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা, অধ্যাপক আবদুল খালেক এবং আবদুল জলীল প্রতিষ্ঠিত গবেষণা কেন্দ্র-রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, মযহারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি, আশরাফ সিদ্দিকীর বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ ইত্যাদি) এবং শিক্ষায়তনিক (বাংলা একাডেমী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ধারা-এই ইত্যবিধ তিনটি প্রক্রিয়ার ও সহযোগিতার মধ্য দিয়েই এই প্রয়াস সমূহ অব্যাহত থাকে। শিক্ষায়তানিক বা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণমুখী ধারাটি সর্বজনীন বা সর্বাধুনিক।

বিশুদ্ধ তত্ত্বীয় ধারা ও বিজ্ঞানমুখী সাধারণ ধারা দুভাবেই আবার এই সর্বশেষ বা আধুনিক ধারাটিকে আমাদের বিচার করতে হবে। গবেষণা পত্রিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও পঠনপাঠনের প্রয়োজনে এই ধারাটি গড়ে ওঠে। বস্তুত আশরাফ সিদ্দিকী ও মযহারুল ইসলাম বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ফিরে এলে, বিশেষত দ্বিতীয়জন বিশ্ববিদ্যালয়ে নবপঠন-পাঠন রীতি প্রবর্তনে উৎসাহী হন। ফলে এই নতুন ধারার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হতে থাকে।

কিন্তু তথাপি উল্লেখ্য যে, বাংলা লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠনে আশরাফ সিদ্দিকী প্রথম এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন এবং বিদেশে লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন বিষয়ে অগ্রগতির প্রথম তথ্য প্রকাশ করেন ষাটদশকে তাঁর 'লোকসাহিত্য' (১৯৬৩) গ্রন্থে। তাত্ত্বিক আলোচনা (আধুনিক) না থাকলেও পটভূমি তথ্য, লোকসাহিত্যের শ্রেণীকরণের ভিত্তি, টাইপ এবং মটিফের পশ্চিমি ধারণাগুলি তিনি এ গ্রন্থে উপস্থিত করেন যথাবিস্তৃত ভাবে।

এসব বিষয়ে প্রথম আলোচনা বিধায় টাইপ ও মটিফের আলোচনাকে তিনি (ড. সিদ্দিকী) কোনও দেশীয় কাহিনীযোগে বিস্তৃত করেন নি। এ বিষয়ে সাধারণ্যেও কোনও আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি সে সময়। লক্ষণীয় তিনি এ গ্রন্থ প্রকাশের পর বাংলা একাডেমী পুরষ্কার পান শিশু সাহিত্যে, গবেষণার জন্য নয় (১৯৬৪)। দেশ বিভাগের পর তিনি (ছাত্র জীবনে) একটি নতুন পালাগান আবিষ্কার করেছিলেন (ফুলকুমারী বা পাটনীর মেয়ে ১৯৪৯)। স্বাধীনতার পরও তিনি কিছু লোককাহিনী সংগ্রহ করেন যেমন, কিশোরগঞ্জের লোককাহিনী (১৯৭১ ও ১৯৯৩); এতে ৩০টি লোক গল্পের টাইপ নিয়ে একটি আলোচনা যুক্ত করেন লেখক । ময়মনসিংহ গীতিকারও পুনঃসম্পাদন করেন তিনি। আশরাফ সিদ্দিকী আধুনিক কালের লোকসাহিত্য গবেষক হয়েও কোনও স্কুল প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হননি। গবেষণার ধারা সৃষ্টিতে তিনি অনেকটাই যেন নিঃসঙ্গ পথিক।

ড. আশরাফ সিদ্দিকীর পর বাংলা লোকসাহিত্যে চর্চার ধারাটি নতুনভাবে গতি লাভ করে মযহারুল ইসলামের হাতেই। পশ্চিমবঙ্গের বিশেষজ্ঞগণের কাজে আধুনিক ধারাটি সৃষ্ট হতে আরও কিছু সময় নেয়। অন্যদিকে শংকর সেনগুপ্তের পরিচালনায় ইন্ডিয়ান ফোকলোর সোসাইটি ও সনৎকুমার মিত্রের প্রতিষ্ঠিত পশ্চিম বঙ্গ লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ প্রভৃতির

কার্যক্রম বাংলাদেশেও প্রভাব বিস্তার করে। স্বাধীনতার পর মযহারুল ইসলাম বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক হন। তার আগে ড. সিদ্দিকীও একই একাডেমীর পরিচালকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। মহাপরিচালকের পদ স্বাধীনতা উত্তর কালে সৃষ্ট, ড. ইসলামই প্রথম এই পদে অধিষ্ঠিত হন। এবং তিনিই লোকসংস্কৃতি গবেষণার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন, আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনেস্কো, ফোর্ড ফাউন্ডেশান, নোরাড প্রভৃতির সহায়তায় একাধিক কর্মশালা ও মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণেরও আয়োজন করা হয়। জেলা ভিত্তিতে নথি সংরক্ষণ, জার্নাল ও সংকলনাদি প্রকাশ ইত্যাকার কার্যক্রমে একটা বেগ সৃষ্টি হয় একাডেমীতে। পরে এশিয়াটিক সোসাইটিও বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করে; বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও পঠন-পাঠনে ও পাঠক্রম নির্মাণে পরিবর্তন আসে।

বলা হয় বাঙালি মাত্রেরই জনসমাবেশ বা মেলার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এই লোকপ্রীতি থেকে লোকজ সৃষ্টির প্রতি তার আগ্রহ কিংবা সৃষ্টি প্রবণতাও। লোকগীতি কাব্য, কাহিনী এবং মহাকাব্যের মধ্যে মিল শুধু কাহিনী এককের সূত্রেই (Epic Laws of Folk narratives) নয়, গণসংযোগ সূত্রেও। ঐক্য ও একাভিপ্রায় তার লক্ষ্য। লোককবি নিজে পরিচয়হীন (নন-অথার) কিন্তু তার সৃষ্টি এক মিথষ্ক্রিয়া। তাত্ত্বিকেরা (author-folklorists) তার ব্যাখ্যাকার। এক সময় 'সাহিত্য' সৃষ্টি ও (মুখে মুখে) প্রচারিত হয়েছিল গণ প্রয়োজনেই এবং তা ছিল সার্বজনীন বা সামষ্টিক আনন্দের, উৎসবের তথা বিনোদনী ক্রিয়ার স্বার্থে। শিষ্ট সাহিত্যকেও গণসাহিত্য হতে হতো তখন,-হোমার বা বেদব্যাসের মহাকাব্য থেকে পাঁচালি পর্যন্ত সবই ছিল গণ সাহিত্য। প্রমথ বিশীর মতে এখন কবি ও জনসমাজের ভাবনার মধ্যে ঐক্য নেই, থাকা সম্ভবও নয়,-তাই খণ্ড-সমাজচিত্র ও কৃত্রিম মানবিক ভাবনার ঐক্য ভাবনার রাজনীতি বা মতবাদ প্রসারেরই চিন্তা আছে এবং এভাবে 'গণ' শব্দের বিশেষ ব্যবহার শুধু প্রাধান্য পাচ্ছে (এর উদাহরণ হচ্ছে গণ-টোকাটুকি, গণহত্যা, গণভবন, গণহারে, গণশৌচাগার, গণ আন্দোলন এমন কি গণ-ধর্ষণ প্রভৃতি)। 'গণ'-তে সমষ্টির বা সমগ্রতার ভাব সরে গিয়ে তাতে খণ্ডিত সীমিত ও উদ্দেশ্য বাচক ভাবার্থটিই মুখ্য হয়েছে। 'লোক' শব্দের সার্বজনীনতা নিয়েও তেমনি সন্দেহ বিস্তর। এখন 'লোক', 'গণদল' এবং 'সাব অলটার্ন' আর্থ-রাজনীতির পঞ্জরে অবস্থান নিয়েছে। 'জন' শব্দেরও অর্থ down stream গতি নিয়ে (জনরব, জনতা, জনযুদ্ধ, জনসেবা, জনসমাজ) গড়ে তুলছে বিচিত্র ব্যবহারী নতুন নতুন শব্দ। এ সবই ব্যবহার-প্রিয় অধিশব্দ। (তুং. 'দীনজন যায় যথা তীর্থ দরশনে'।) 'লোক সভা' কিংবা 'জনতা পার্টি'তেই চীর খাচ্ছে সমাজ সত্তার মূল শব্দের এই প্রকাশ। এখন এই শব্দ-সত্য পুনরাবিষ্কারযোগ্য ।

'চর্যাপদ' আবিষ্কৃত হলে (১৯১০) তার সঙ্গে গণ সম্পর্কের ভাবনা যুক্ত হয়নি, হয়েছিলো 'শ্রীকৃর্ষকীর্তন'-এর সময় (১৯০৯)। অবশ্য তার আগেও কীর্তন ছিল এবং কীর্তন গানের মূলস্থান ও বৈষ্ণব সমাজের মুখ্য গুরুস্থানকে 'শ্রীখন্ড' নামে চিহ্নিত করা হতো। রবীন্দ্রনাথের 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭) প্রকাশের আগে থেকেই লোকঐতিহ্য সন্ধানের আন্তরিক কর্মপ্রবাহটি ফল্গুস্তর থেকে উৎসারিত হবার অপেক্ষায় ছিল মাত্র। এখন সেখান থেকে দ্বিতীয় দশক কালের মধ্যেই 'ময়মনসিংহগীতিকা (১৩২২-২৪) এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের আবিষ্কৃত হারানো জগৎ (বিশেষত 'পুথি সম্পদ') পুনরাবিষ্কৃত হল এবং আব্বাসউদ্দীনের জনপ্রিয়তায় পল্লী সঙ্গীতের চর্চায়ও জোয়ার এলো। প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি এ এক অপূর্ব মনোযোগ। রবীন্দ্রনাথকে লক্ষ্য রেখে (পরে পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হয়ে) একটা আন্দোলনের মত গড়ে ওঠে এই লোকজ প্রেম।

এইভাবে পরে শিক্ষা আন্দোলনগুলির সাথেও এলো ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, সাংবাদিকতা ও যোগাযোগতত্ত্ব এবং যাদুঘরবিদ্যা (Museumology) যাতে আঞ্চলিক ও জনপদী নৃ-গোষ্ঠীক ক্রিয়া-কর্মের ওপর দৃষ্টিদানের প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গগুলি লাভ করে অসামান্য গুরুত্বত্ত। ফোকলোর-চর্চা স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন হিসাবে মূল্য পেল বহির্জগতের সঙ্গে সংযোগের সুযোগ সৃষ্টির সাথে সাথে (বৃত্তি লাভ, চাকুরি গ্রহণ, বিদেশ ভ্রমণ, সেমিনারে অংশ গ্রহণ প্রভৃতি কারণে)। ইতোমধ্যে কোর্স পদ্ধতির শিক্ষা আন্দোলন অন্যান্য নতুনতর বিষয়ের সাথে ফোকলোরের পঠনপাঠনের ক্ষেত্রকে আরও সহজতর করে তুললো। ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ গীতিকার দুএকটি পালার পাঠপঠনেই সীমিত ছিল তা । তাও সর্বত্র আবশ্যিক পাঠ্য হিসাবে নয়। এখন সেখানে পূর্ণ কোর্সের (তত্ত্বপাঠ সহ) ব্যবস্থা হল। অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবও ক্রমে পূরণ হতে থাকে। এ বিষয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পূর্ণ বিভাগও সৃষ্টি হল এই ধারা ক্রমে।

৯. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৯৮ সালের শেষ ভাগে রাজশাহীতে মাত্র কুড়িজন ছাত্র নিয়ে বিভাগটি প্রতিষ্ঠিত হয়; সভাপতি হন প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল জলিল। ড. মযহারুল ইসলাম, ড. আবদুল খালেক, প্রমুখের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা ও সহযোগিতায় অচিরেই বিভাগটি দাঁড়িয়ে যায়। নামকরণ হয় "ফোকলার বিভাগ"। প্রথম থেকেই পঠনপাঠনেরই পাশাপাশি ক্ষেত্র সমীক্ষা বা ফিল্ড স্টাডি ও প্রতিবেদন লেখনের ওপর জোর দেওয়া হয়। একটি সমৃদ্ধ সেমিনার লাইব্রেরি ও যাদুঘরও (ফোক-মিউজিয়াম) গড়ে তোলা হয় সমবেত প্রচেষ্টায়। এতে ছাত্র-শিক্ষকের যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে, 'লালনচর্চা-কেন্দ্র'ও। 'ফোকলোর সমিতি'; প্রকাশিত হয় গবেষণা পাত্রিকা-'ফোকলোর জার্নাল' এবং ছাত্র সমিতির প্রকাশনা 'ব্রাত্য'। এই বিভাগ থেকে প্রচারিত 'বিভাগ পরিচিতি' মূলক হ্যান্ডআউটে বলা হয় যে ফোকলোর আধুনিক পঠনপাঠনের বিষয়সমূহেরই অন্যতম, কারণ এতে রয়েছে 'সময়ের যৌক্তিকদাবী'। এর বিষয় তাই প্রথানুগ জ্ঞানানুশীলনের মধ্যেই সীমিত নয় বরং তা বহু সম্প্রসারিত। দেশ-প্রীতি, আত্মোপলব্ধি এবং সৃষ্টিশীল ও প্রতিবাদ-প্রতিরোধী সত্তার সক্রিয় অবস্থানের প্রয়োজনে ঐতিহ্যবোধের সঞ্চার ও তার কর্মশীলতার বাস্তবায়নই এখন যুগের দাবী। ফোকলোরের পঠনপাঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এখন সেই দিকে। বিভিন্ন জ্ঞাতিবিদ্যার (যেমন নৃতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্ব থেকে সাহিত্য, দর্শন এমন কি পর্যটন বিদ্যা ও যাদুঘর বিদ্যা প্রভৃতি) পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ স্পর্শধন্য ফোকলোর এখন উন্নত প্রসারিত ও পরিশীলিত এক স্বতন্ত্র শিক্ষাগত শৃঙ্খলা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্নশ্রেণীতে প্রদত্ত কোর্সের নমুনা থেকেও তা আরও স্পষ্ট উপলব্ধি সম্ভব।

১ম বর্ষ স্নাতক : ফোকলোর পরিচিতি, পরিভাষা, ফোকলোর চর্চার ইতিহাস, লোকছড়া, প্রাচীন কাব্যাদি।

২য় বর্ষ স্নাতক : বাংলার লোক উৎসব ও লোকাচার, লোকনাট্য, ফোকলোরের মতবাদ, পদ্ধতি ও প্রয়োগ, ধাঁধা-প্রবাদ-প্রবচন, নন্দনতত্ত্ব, লোককাব্যতত্ত্ব ও সাহিত্যের রূপশ্রেণী ইত্যাদি।

৩য় বর্ষ স্নাতক : বাংলা সাহিত্যে লোক- উপাদান (মধ্যযুগ), বাংলা লোক নৃত্য, লোক-ক্রীড়া, লোকসংগীত, লোকউপাখ্যান, সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব ও লোকভাষা, আর্কাইভ ও জাদুঘর বিদ্যা ইত্যাদি।

৪র্থ বর্ষ স্নাতক : বাংলার লোকধর্ম ও লোক সম্প্রদায়, বাংলাসাহিত্যে লোক উপাদান (আধুনিক), লোকপুরাণ বিদ্যা, বাংলার লোকগীতিকা, বাংলার লোক-শিল্প, লোকবিজ্ঞান প্রযুক্তি, লোক চিকিৎসা, লোকগত যোগাযোগ, আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, প্রথম বর্ষ ব্যতীত অন্যান্য বর্ষে 'ক্ষেত্রসমীক্ষা' ও 'প্রতিবেদন নির্মাণ' আবশ্যিক হিসাবে রাখা হয়েছে। বিভাগীয় শিক্ষকগণই লোকদর্শনের পাশাপাশি সুফিদর্শন, জেণ্ডার ও ফোকলোর, বস্তুধর্মী লোকসংস্কৃতি, প্রায়োগিক ফোকলোর প্রভৃতিরও পঠনপাঠন দিয়ে থাকেন। কোষগ্রন্থ ও বিবলিওগ্রাফি প্রস্তুতের জন্যও রয়েছে বিভাগীয় চিন্তাভাবনা।

প্রবন্ধপাঠ (সেমিনার দেওয়া) বিভাগের একটি নিয়মিত কর্মসূচি। ২০০৭ সালে মযহারুল ইসলাম ও ফোকলোর ইন্সটিটিউটের সহযোগে বিভাগে একটি জাতীয় ফোকলোর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে প্রকাশিত সুভেনীরে বলা হয় যে, মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং প্রযুক্তি ও মিডিয়ার কল্যাণে গ্রামেগঞ্জে আজ শুধু অশুভ প্রভাবই পড়ছে না, ঐতিহ্য সংস্কৃতিরও বিলয় ঘটছে। বিশেষভাবে বনদস্যুদের কারণে অরণ্য নিধনের (দক্ষিণ বঙ্গের ম্যানগ্রোভ ফরেস্টসহ) কারণে অরণ্য-কেন্দ্রি সংস্কৃতি বনবিবি, বনদুর্গা গাজী দক্ষিণ রায় আশ্রয়ী আচার ও যাপিত জীবনাচার প্রভৃতি) বিলুপ্ত হতে বাধ্য। সংস্কৃতি ও রুচির পরিবর্তন তরুণদের মধ্যে ব্যাপক। আরবান ফেয়ার তথা ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার আকর্ষণে সাংস্কৃতিক পণ্যের ভোক্তারা মার খাচ্ছে। এর জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ ও পরিকল্পনা গ্রহণ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্যে অত্যাবশ্যক। ফোকলোর এর পঠনপাঠনের মধ্যে সমাজে চেতনা সৃষ্টি ও চেতনার প্রসারই আজ ভরসা মাত্র। সুখের বিষয় এই বিভাগটি সেই লক্ষ্যেই যথানিবিষ্ট।

১০. স্থানিকতা (endmical) না স্থান-প্রসারতা : বাংলাদেশ ফোকলোর চর্চার ঐতিহ্যের ধারায় বিশ্বায়নী প্রভাব।

ঈশ্বরগুপ্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্ট ধারাসমূহ থেকে কিছুটা সরে এসে বাংলাদেশে নতুন ফোকলোর-চর্চার ধারা গড়ে ওঠে। প্রথম পর্যায়ে পুথিচর্চার বলয়ে (মধ্যযুগের সাহিত্য অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় মধ্যযুগীয় সৃষ্টি ধারা অনেক অগ্রসরশীল ছিল এই মত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এবং একই সাথে এই সাহিত্য অবহেলিত হয়েছিল এই সত্যের প্রতিক্রিয়ায় আবদ্ধ থাকলেও ক্রমে দোভাষী পুথির আলোচনা (আনিসুজ্জামান প্রমুখের আলোচনা স্মরণ্য; মযহারুল ইসলামের প্রথম গবেষণাও ছিল এই ধারারই কবি হেয়াৎ মামুদের কাব্য) এবং পরে লোকঐতিহ্য (স্থানিক) সন্ধানে তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। আহমদ শরীফ প্রমুখের বাউল দর্শন ও সত্য পীর-সংস্কৃতি, পুথি পরিচয় পুনঃসন্ধান (সম্পাদন) সুফি সাহিত্য, বিভিন্ন দোভাষী সাহিত্যের নমুনা সংকলন প্রভৃতি এবং সৈয়দ সুলতান, শেখ ফয়জুল্লাহ, জয়েনউদ্দিন, মুজাম্মিল, শেখ মনসুর, শেখ মুতালিব, খোন্দকার নসরুল্লাহ প্রমুখ অন্ত্য মধ্যযুগের ধর্মতাত্ত্বিক কবিদের (আলাওল, মুহম্মদ কবীর, আলী রজা, আবদুল হাকিম, মুহম্মদ খান, শাবিরিদ খান এঁরা কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির হয়েও এই ধারায় যুক্ত হয়েছেন ধর্ম-সাওয়াল, তত্ত্ব ও শাস্ত্রজ্ঞানমূলক রচনায় পারদর্শিতা প্রদর্শনের কারণে। আলোচনা মূলে এই দৃষ্টিভঙ্গিই কাজ করে। আহমদ শরীফ নিজেও বলেন, 'এ দেশে রচিত শাস্ত্রগ্রন্থ অবিমিশ্র শরীয়ৎ কথা পাইনে, মরমীদের বিভিন্ন মোকাম-মঞ্জিলের সঙ্গে মৌখিক আচারের রীতিও পাই।' এই ধারণায় সুলতান আহমদ ভূইয়া, আবদুল কাইউম, রাজিয়া সুলতানা, মুহম্মদ আবূ তালিব, অধ্যাপক আদমউদ্দিন, মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সাহিত্যরত্ন, অধ্যাপক বাবর আলী প্রমুখ এবং এদের আগে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, আবদুল

করিম সাহিত্য বিশারদ, অধ্যাপক মরসুরউদ্দীন, আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধান বিশারদ, মুহম্মদ এনামুল হক, আলী আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখের অবদান স্মরণীয়।

এই আলোচনার ধারাটিকে বিশুদ্ধ লোকসাহিত্যের ধারা বলা যাবে না। তবে, লোকসাহিত্যচর্চার একটা পটভূমি ও অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল এঁদের এই আগ্রহে। তাছাড়া এঁরা সকলেই লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির কোনও না কোনও দিক নিয়ে আলোচনাও রেখে গেছেন।

উপকরণ সংগ্রহ, সংকলন ও সামান্যত তথ্যবিশ্লেষণ-এর ধারাটি এই সময় থেকেই গড়ে উঠতে থাকে; সে কথা যথা বিস্তৃত উল্লেখ রাখার প্রয়াস দেখা যায় কয়েকটি পঞ্জিগ্রন্থে, যার মধ্যে আমার 'বাংলাদেশে লোকসংস্কৃতি সন্ধান ১৯৪৭-১৯৭৯' গ্রন্থটি (১৯৮২) অন্যতম দালিলিক সংযোজন। সাধারণ সংকলনে মনসুরউদ্দীন, রওশন ইজদানী, জসীমউদদীন, আবদুল গণি, কাজী দীন মুহম্মদ, অমলেন্দু বিশ্বাস, আবদুস সাত্তার চৌধুরী, ওহীদুল আলম, ইছহাক চৌধুরী, মুহম্মদ আবদুল জলিল, খন্দকার রিয়াজুল হক, মোস্তাফিজুর রহমান, মুহম্মদ আবূতালিব, আবদুল করিম (টাঙ্গাইল) প্রমুখ এবং অন্যান্য আলোচনায় ও বিশ্লেষণে আতোয়ার রহমান, আজিজুর রহমান, আজিজুল হক, আবুল আহসান চৌধুরী, আবদুল ওয়াহাব, আবদুস সাত্তার, আলমগীর জলীল, আলী নওয়াজ, বদিউজ্জামান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ আবদুল হাফিজ, মোমেন চৌধুরী, মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন কাশিমপুরী, মোহাম্মদ হানিফ পাঠান ও তৎপুত্র মোহাম্মদ হাবিবুল্লা পাঠান, মোহাম্মদ সাইদুর, সামীয়ুল ইসলাম, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ নামগুলি এই পর্বের কীর্ত্তিস্য জন। পঞ্জি নিয়েও বেশ কিছু কাজ হয়েছে এ সময় (আবদুর রাজ্জাক, শামসুজ্জামান খান, মোমেন চৌধুরী ও বর্তমান লেখক)। গ্রন্থতালিকায় নতুন যে নামগুলি উঠে আসে তাদের মধ্যে অধ্যাপক মাহবুবুল হক, ড. সামসুল হোসাইন, হাবিবুর রহমান, রমা চৌধুরী প্রমুখ ও ফোকলের বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষকেরা (নিচে দ্রষ্টব্য) বিশিষ্টতার দাবীদার।

আগে উল্লিখিত হয়েছে আশরাফ সিদ্দিকী উপাদান সংগ্রহ ও সম্পাদন ছাড়াও পশ্চিমী চিন্তার বিষয়গুলো প্রথম বাংলাভাষায় প্রকাশ করেন ষাটের দশকে (বিশশতক)। আধুনিক ধারার যাত্রা পূর্ণতর হয় মযহারুল ইসলামের নেতৃত্বে। এই ধারায় ও অন্তর্বর্তী ধারায় আর যে নামগুলি আসে তারা হলেন অধ্যক্ষ আনোয়ারুল করীম, শামসুজ্জামান খান, ওয়াকিল আহমদ, সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ প্রমুখ। বিশুদ্ধ তত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ মযহারুল ইসলাম ব্যতীত অন্যদের মধ্যে বিরল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগের অধ্যাপক আবদুল খালেক ও তাঁর সহকর্মীদর মধ্যে (তরুণদের মধ্যে নাজমুল হক, শাহিদা খাতুন, অশোক বিশ্বাস, মোহাম্মদ জসিম, সাইফুদ্দিন চৌধুরী, অধ্যাপক শাহীদুর রহমান, আব্দুল ওয়াহাব, আবুল হাসান চৌধুরী প্রমুখের নামসহ) অনেকের কাজেই এখন অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে তরুণ গবেষকগণের মধ্যে (মমতাজ বেগম, মো. নুরুল ইসলাম, মো. নুরুল ইসলাম খান, মামুন তরফদার, মো. বেলাল হোসেন, মোবাররা সিদ্দিকা, আখতার হোসেন, মোস্তফা তরিকুল আহসান, সুস্মিতা চক্রবর্তী, জাহাঙ্গীর হোসেন, মো. আবদুল্লাহ আল মামুন) যাঁরা অনেকেই আবদুল খালেক, মোহাম্মদ আবুল ফজল, ম-আলমগীর জলীলের তত্ত্বাবধানে কাজ করেছেন ও করছেন তাঁদের মধ্যে এখন এই নবতর চেতনাই কাজ করছে। তাঁদের ভবিষৎ আশাপ্রদ বলা যায়। তবে আধুনিক ধারার শীর্ষে এখনও মযহারুল ইসলাম (প্রয়াত ২০০৮) এর অবদান ও নির্দেশনাকেই আমাদের স্মরণ করতে হয়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ও তাদের গবেষণা পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত গবেষণাগুলির মধ্যেও যে কিছু অগ্রগতি ঘটে নি তা নয় তবে তা উপরোক্ত ধারণার খুব বেশি ব্যতিক্রম কিছু নয়। অবশ্য তাদের এই প্রয়াসে ও সেই সাথে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে পাঠক্রম নির্দিষ্ট হয় তাতে 'ফোকলোরে'র অন্তর্গত বেশ কিছুটা স্পষ্টতর হয়েছে। সম্প্রতি তাকে আরও সম্প্রসারিতও করা হয়েছে আধুনিক যুগের চাহিদা এবং দেশজ প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে। ফলে এই প্রসারিত দৃষ্টিকোণের কারণে এই পাঠক্রমের সাথে যুক্ত হয়েছে আন্ত:বিষয়ক নানা বিদ্যা। অর্থাৎ নন্দনতত্ত্ব, লোকধর্ম ও পুরাণতত্ত্ব, লোকপ্রযুক্তি ও চিকিৎসা (টোটকা তত্ত্ব ও খোনকারী বিদ্যা), যোগাযোগ প্রক্রিয়া, লোক-ক্রীড়া এবং যাদুঘর বিদ্যা (Museumology) ও আর্কাইভিং প্রভৃতি বিষয়কেও গ্রহণ করা হয়েছে এই পাঠক্রমের মধ্যে।

এই বিষয় ব্যাপ্তি ও Extra-folkloric চিন্তার সাথে ও non-folk materials এর বিষয়-যুক্তির কারণে সবাই এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাবেন এমন হয়ত ষোলআনা আশা করা যায় না, তবু কালের ব্যবধানে ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের কারণে শীঘ্রই একদিন এইটুকুও যে অনেক পশাৎবর্তী বলে মনে হবে না তাও বলা যায় না। উল্লিখিত পাঠ্যসূচিতে 'ফোকলোর' কে বহুগামী বা বিচিত্র বিষয়-যুক্ত বিদ্যা বলে মনে হলেও 'ফোক' এর আগামী দিনের সংজ্ঞার যে পরিবর্তন ঘটবে, সে কথা ভূমিকাতেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। যেমন 'ফোক-লাইফ'-এর ধারণা বা তত্ত্ব তার মধ্যে একটি সম্প্রসারিত ও প্রভাবক চিন্তা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যা ছিল লোক সৃষ্টিকলা, তার সাথে পরিবর্তিত লোকজীবনের দর্শন বা চিন্তাধারা যুক্ত হতে শুরু করেছে এখনই। আমাদের এখানেও লোক-নির্দেশক বিষয়গুলি অ-লোক নির্দেশক বস্তু থেকে পৃথক ভাবে দেখা হচ্ছে বা তার সম্ভাবনা স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। কেচ্ছা গীত প্রবাদ প্রথা আচার মন্ত্র যাত্রা প্রভৃতি যা কিছুই কৃষি সমাজের ভিতর স্বভাবগতভাবে পাই, সে সবের লোকবস্তু-সাপেক্ষতায় সন্দেহ নেই, অনায়াসেই তা উপলব্ধি করা যায়। কেবল এগুলি স্রষ্টা পরিচয়হীন (non-author folk) । ফলে এর ভিতরে author folklorist দের কর্তৃত্ব এসে ঢুকেছে, যদিও বৃহত্তর জগতে লৌকিক জ্ঞানের প্রসারই তার লক্ষ্য।

কিন্তু এখন সাক্ষরতাহীন জগতকে সংকুচিত করা হচ্ছে অন্যভাবেও। এখন কৃষি-আবাদিক মননকে সাক্ষরতার জগতে নতুন পরিচয়ে ও নতুন বন্ধনে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন 'মেলার' স্থান নিচ্ছে 'লোকউৎসব' এবং এইভাবে সব কিছুর সাথে যুক্ত হচ্ছে 'লোকজ'। লোক-যুক্ত হয়ে একই বস্তুকে দেখছি ভিন্নরূপে (লোকগান, লোকনাট্য, লোকধর্ম ইত্যাদি)। অনেক ক্ষেত্রে 'আঞ্চলিক' শব্দটিও ব্যবহৃত হচ্ছে তৎস্থলে (আঞ্চলিক গান ইত্যাদি)। 'আঞ্চলিক' হলেই যে তা 'লোকজ' হয় না সে কথা 'আঞ্চলিক স্থাপত্যের নির্দশন' প্রভৃতি ব্যবহারের মধ্যে যথারীতি স্পষ্ট হয়ে আছে। কিন্তু ময়মনসিংহ-গীতিকা, ঢাকাইয়া গীত, মনিপুরী নৃত্য প্রভৃতিতে 'আঞ্চলিক'-এর যেটুকু রেশ পাওয়া যায় সেটাই প্রকৃত লোকজ সত্তার পরিচিতি বাহক। লোক-ঐতিহ্য পরম্পরাগত হলেও স্থানিকতার বৈশিষ্ট্য (endimicism) এবং দ্বীপিয়তার (insularity) ধর্মে বিশিষ্ট। পুরোনো বা সেকেলে জিনিষ বা মানুষ কথাটাতেও সেই ভাবযুক্ত। কিন্তু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় তাতে একটা কদর্থতা কিংবা হেয় প্রতিপন্ন করার দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে মনের অজান্তে। একই কারণে শহর বা শহরের উপকণ্ঠে এবং ভাসমান (বাইদ্যা, 'বেড়াজ্যা' প্রভৃতি) মানুষের বেলায় এই মনোভাবের কোনও পরিবর্তন ঘটে না, বিশেষত 'ডাউন কাস্ট' ভাবনা বা দৃষ্টি যেখানে কাজ করে। এসব সন্দেহ খণ্ডিত চিন্তা ও হীনমন্যতার প্রকাশ লোকসাহিত্য ধারণ করে না। কারণ

লোক-সম্মিলন ও মিথষ্ক্রিয়াই লোকসৃষ্টিকে চলমান গতিমান সঞ্চারমান ও সতত সঞ্জীবিত রাখে। 'গ্রামে'র (বা এই সবলোক যেখানেই জীবিকার সন্ধানে আত্মপ্রকাশ করে) লোকেরা হতদরিদ্র, হতমান ও সাবঅলটার্ন বলেই (বা তাদের সেভাবে দেখা হয় বলেই) তাদের আত্মপ্রকাশও হয় তদরূপ। কিন্তু আজ 'পরিবর্তন'-এর পালায় অন্যভাবে তাদের বিচার করতে হবে। তার জন্য নতুন বিদ্যা কিংবা পুরনো বিদ্যার নতুন সাজ ও পরিবর্তিত দৃষ্টি অত্যাবশ্যক। ফোকলোরের পঠনপাঠন আজ সেই দিকে।

দুটি সমার্থক প্রবাদ (একটি পুরনো সমাজের আর একটি নতুন সমাজের) থেকে ব্যবহারকারীর সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের (কিন্তু সৃষ্টি-কর্মে একই ধর্ম বা প্রক্রিয়া রক্ষার) ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। ঐতিহ্যিক অভ্যাস ও ক্রিয়া সম্পাদনের এই সদৃশতাই ফোকলোরের মূলশক্তি। এটাই লোকজসৃষ্টির চলমানতা ও ঐতিহ্যিকতার প্রসার। উদাহরণ-

ক. সনাতন সমাজের প্রকাশ রূপ (প্যারাডাইমে অশ্লীল শব্দরূপ বাদ রেখে)-
'কই (কোথায়) আশমানের তারা, কই গোবরের পাড়া'।
খ. আধুনিক সমাজের প্রকাশভঙ্গি (সংগ্রহ)-
'কোথায় হেনরি কিসিঞ্জার কোথায় লঞ্চের প্যাসেঞ্জার।'

এখানে সামাজিক শ্রেণী (শ্রমিক/জোতদার, শিক্ষিত. মুর্খ জনসমাজ) কিংবা লৈঙ্গিক ভেদ এমনকি স্থানিকতার চারিত্র্য (গ্রাম-শহরতলী-নগর ও বাজার) গুরুত্ব লাভ করে নি-সে সব তথ্য তাৎপর্যহীন। এতে প্রমাণ পায় যে লোকসাহিত্য সৃষ্টির জন্য গ্রামসমাজ বা জনসমাজের বিবিক্ত বেষ্টন জরুরি শর্ত নয়। অবশ্য মিশ্র সমাজে অঞ্চল বিশেষে তার প্রকাশ-ভিন্নতাও লক্ষ্য করা যে অসম্ভব তাও না, যেমন দক্ষিণ চট্টগ্রামে পাই-'ক'ডে আদিনাথের পা'র, ক'ডে ছ'অলে খের খার' (কোথায় আদিনাথ মন্দিরের পাহাড় কোথায় ছাগলে ঘাস খায়)। কিন্তু এতে তাৎপর্যের তারতম্য ঘটেনা। নির্মল দাশ এজন্য লোকভাষা কী এবং কী না তা স্পষ্টভাবে আলাদা করার পক্ষপাতী না হয়েও বলেন লোকসৃষ্টি এক বিচিত্র বিষয়-বাগভঙ্গিতে ঐতিহ্যিক ছাঁচ, ভ্রষ্টাচার ও তীক্ষ্ণ তীর্যাত্মক ও ব্যঙ্গাত্মক মুখরতার চিহ্ন রেখেও তা লোকজ। ভোটের ছড়া কিংবা আধুনিক শব্দযুক্ত কোনও সৃষ্টি (যেমন পূর্বোল্লিখিত 'প্যাসেঞ্জার' প্রভৃতি) কোনও কিছুরই লোকজ সৃষ্টি তথা লোকসাহিত্য হতে বাধা নেই। অবশ্য অনিমেষ পাল প্রমুখের মতে শহুরে বা শিক্ষিত লোক-মুখের নামহীন সৃষ্টি হলেই তাকে 'লোকসাহিত্য' বলা যাবে তা নয়, সেই 'লোকের' সাথে কৃষি সমাজের সংযোগ ('কৃষি আয়ুধে'র উন্নতি ঘটলেও) থাকতে হবে; সেটা আবশ্যিক শর্ত । অপর গবেষক সনৎকুমার মিত্রের মত ঠিক এক রকম নয়। তিনি বলতে চান, সঞ্চরণশীলতাই লোকজ ধর্ম; মাধ্যম কী তা প্রধান নয়। আবার অনেকে মনে করে স্থানিকতা বা endemicality-র মধ্যেই তার যথার্থ স্বরূপ বিদ্যমান।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমের সর্বশেষ ধারণাটি এখানে আমরা উদ্ধৃত করতে পারি। সেখানে বর্ণিত সনাতন সামাজিক শিক্ষার (লেখাপড়ার বিদ্যা বহির্ভূত non-education) প্রপঞ্চরূপে ও মৌখিক সৃষ্টির পরম্পরায় লভ্য লোকসৃষ্টির সীমিত জগতটাকে আরও বর্ধিত করার চিন্তা যুক্ত হতে দেখা যায়। মৌখিক সৃষ্টিকে আর আবশ্যিক শর্ত হিসাবে দেখা হয় না। মৌখিক ও অ-মৌখিক (non verbal forms of) প্রকাশের সম্পর্ক, প্রান্তিয়তা ও পরিবেশগত সমান্তরলতার বিষয়গুলি খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে আজ সেখানে। নিরক্ষতার স্থলে সাক্ষরতার বিকল্পের কথা ভাবা হচ্ছে একই উপযোগ ও লক্ষ্যের উপস্থিতি বিচার করে,- বিশেষত যেখানে সাক্ষর 'লোকের' সৃষ্টি ভিন্ন হলেও `they are still governed by

traditional rules'. এজন্য পোলিশ লোকসাহিত্য-বিজ্ঞানী *আনা ব্রজজৌস্কি ও অন্যান্য* (১৯৯৯) আধুনিক লোকসাহিত্য-চর্চার বিষয়টা এইভাবে ব্যাখ্যা করেন-

'Today these kinds of folklore occur on the level of symbolic culture or of life in a technological society, rather than on the level of social institutions and organisations., Traditional folklore with its forms of psycho-social expression (traditional folklore Vs. literary genre studies or literary forms of folklore), has been replaced by new forms of textual activity that are viable in modern times; e.g. urban legends, sensational stories,various forms of humour, different kinds of epigrams, as well as children's books of wise sayings, albums votive books and graffiti.
বাংলাদেশের লোকসাহিত্য চর্চায় এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ আজ অপেক্ষিত।

১১. উপসংহার

লোক সাহিত্যের শ্রুতিগত ও স্মৃতিনির্ভর জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্য একসময় পাড়া গেঁয়ে ধারণার মধ্যে সীমিত ছিল, আজ ঘটেছে তার নানা বিস্তার এবং বিশ্লেষণ। এই বিস্তারে শহুরে আলোচনারই প্রাধান্য এখন। তদুপরি সেই ঐতিহ্যগত জ্ঞান বা 'লোর' (lore)-এর প্রাকৃত ছন্দোবদ্ধ (lyrical) রূপ এখন রূপান্তরিত হয়েছে গদ্যে। শহুরে সমাজের গভীর তলে (deep structure) এই জ্ঞান-সংস্কৃতির গীতল অবস্থানও আজ অনুমান সাপেক্ষ। তবুও আধনিক সংস্কৃতির উৎস একেবারে শূন্যযাত্রা এ কথা ভাবারও কারণ নেই। কৃষি সভ্যতার জনব্যাপ্ত পুরাতত্ত্ব-কেই উইলিয়ম জন থমস নতুন নামকরণ করেছিলেন এবং আমেরিকার লোকসাহিত্যবিদ রিচার্ড ডরসন এই জ্ঞানকে মানব সমাজের এক বিরাট প্রাপ্তি বলে অভিহিত করেছিলেন। এই ধারণার বিকাশে পূর্ববর্তী যুগের মনীষীদের অবদান সুপ্রচুর। বিশেষত ১৮৭৮ (যখন থমস অনুসারী ব্রিটিশ লোকসাহিত্য সন্ধানী সম্প্রদায় সম্মিলিত ভাবে লোকসাহিত্য গবেষণা সমাজ গড়ে তোলেন ও তার বিস্তার ঘটাতে উৎসাহী ভূমিকা গ্রহণ করেন) বা তারও পূর্ব থেকে পরবর্তী কর্মযজ্ঞের অনেক বিজ্ঞজন, সংগ্রাহক ও শেষে তাত্ত্বিকগণ সক্রিয় অংশ নেন। এদের মধ্যে এন্ড্রুল্যাং, জি. এম. গম (Gomme), আলফ্রেড নাফট, ই. এস. হার্ট. এডওয়ার্ড ক্লদ, ডব্লু-এ-ক্লোনস্টন প্রমুখের কথা বিশেষ ভাবেই উল্লেখ্য। এঁদের পরবর্তী উত্তরসূরীগণের কালে এসে যে লোকগীতজ্ঞান বা লোকসাহিত্য আদিতে রচয়িতাহীন সৃষ্টিরূপে জনপ্রিয় ছিল (non-authorship) তাকে author folkloristদের সম্পদে রূপ দেওয়া হল। একটা তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিতর ব্যাখ্যা ও বিন্যাস পদ্ধতি গড়ে উঠলো আমেরিকা এবং রাশিয়ায়। গত শতকের মধ্যপর্বান্তে এর এই বিকাশ ও পরিণতির পরিচয় পরিজ্ঞাত হল সমগ্র পৃথিবীতে।

প্রথমে এর সুস্পষ্ট সূত্রপাত ঘটে জার্মানিতে (গ্রীমভ্রাতৃদ্বয়ের লোককাহিনীর তুলনা-তথ্য পাওয়া যায় ১৮১২-১৮২২এ, তবে ১৮৫৬ পর্যন্তই ছিল এই তৌলন আলোচনার নানা জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রসার)। ম্যাক্সমূলার ইংল্যান্ডে এসে ভাষার উৎসতত্ত্বের সাথে পুরাণেরও উৎস সন্ধান করেন। এ্যাঞ্জেলো দ্য গবারনেটিশ-এর পশুগল্পের ভেদ-নির্ণয় তত্ত্ব জানা যায় উনিশ শতকের তৃতীয় পর্যায়েই। ১৯শতকের শেষ দশকে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের প্রভাব থেকে ভাষা-বিশ্লেষণের মত লোকসমাজের ভাষিক প্রকাশ (লোকজ সৃষ্টি, যার লক্ষ্য মানুষ ও প্রতীক মানুষ যেমন পরী-দৈত্যদানব-পশু-মাছ-পাখি-কাঠের পুতুল এবং কল্পনা-সম্ভব যে কোনও প্রাকৃতিক ও আধিদৈবিক শক্তির রূপ) সমূহের বিশ্লেষণ শুরু হয় নানা দৃষ্টিকোণে-যেমন, তুলনাত্মক, ঐতিহাসিক (পরিবর্তন ও পরিভ্রমণ কথা এবং উৎস চিন্তা) এবং সাংগঠনিক (অঙ্গতাত্ত্বিক) প্রভৃতি ধারায় ও নির্দিষ্ট কাঠামোতে।

জর্জ ফ্রেজার, ম্যাক কুলোক, এন্ড্রুল্যাং এবং পরবর্তীতে আরও যারা অভিনিবেশ সহকারে এই আলোচনার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে আসেন ও নবপরিণতি দান করেন (প্রপিয়ান ও স্ট্রাউসের ধারা), বাংলাদেশে লোকসাহিত্য চর্চার ধারা সনাতন এবং এই আধুনিক উভয় পথেই আপন স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে সেই পথদ্রষ্টাদের পদচিহ্ন স্মরণ করেই। উনিশ শতক বা আরও আগে থেকেই এর শুরু। এর বিভিন্ন কালিক অগ্রগতিও নানা বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। যেমন রবীন্দ্রনাথ কিংবা দীনেশ সেনের ব্যতিক্রমী প্রয়াসসমূহ।

যাইহোক, বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের পর আমাদের সংস্কৃতি জগতে নবজাগরণের ধারা যুক্ত হয়। ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, জনতত্ত্ব, নাট্যতত্ত্ব ও মঞ্চায়ন, অনুবাদতত্ত্ব ও অনুবাদ, লোকায়ত দর্শন, পুথির পঠনপাঠন, শিল্পতত্ত্ব ও শিল্প এবং আধুনিক জ্ঞানচর্চার একাধিক নবতর ক্ষেত্রে এ সময় আগ্রহ দেখা দেয়। লোকসাংস্কৃতি চর্চায় সেই একই আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশই ক্রমাগ্রসরতা লাভ করেছে এবং তাতে নিজস্ব শক্তিও অর্জিত হয়েছে। সেই শক্তি আজ বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।

পরিশিষ্ট

[বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত লোকসাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি পত্রিকার প্রথম সংখ্যাগুলির সূচিপত্র এখানে দেওয়া হল।]

ক. ***লোক ঐতিহ্য*** (সম্পাদক : আনোয়ারুল করীম) প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা (১৯৭৩) ঃ Bangladesh Folklore Research Institute, Ishurdi Road, Kustia

খ. ***লোকসাহিত্য*** (সম্পাদক : আবুল আহসান চৌদুরী) প্রথম বর্স, প্রথম সংখ্যাঃ জানু, ১৯৭৫/ পৌষ ১৩৮১–

লেখক ও বিষয় : সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায় (আশীর্বাণী)- নীলরতন মজুমদার (লালন)- কাজী মোতাহার হোসেন (কৃষ্টিয়ার স্মৃতি)- ওয়াকিল আহমদ (লোকসাহিত্য চর্চা)- আ. কা মো. যাকারিয়া (বারবাজার-গ্রাম)- আতোয়ার রহমান (পথের সাহিত্য)- আহমদ শরীফ (সেক শুভোদয়া)- সৈয়দ মুর্তাজা আলী (কুষ্টিয়ার ইতহাস)- মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (কর্ম সঙ্গীত)- শ.ম. শওকত আলী (মীর মানসের দ্বন্দ্ব)- আশরাফ সিদ্দিকী (স্থান নাম)- আবুল আহসান চৌধুরী (লালন জীবনীর উপাদান)- গ্রন্থ সমালোচনা (অন্নদাশঙ্কর রায় : লালন স্মারক গ্রন্থ; মনসুর মুসা : গুপিচন্দ্রের সন্যাস)। প্রচ্ছদ : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।

গ. লোকসংস্কৃতি

[সম্পাদক : মুহম্মদ আবদুল জলিল। নির্বাহী সম্পাদক ও প্রকাশক, আবুল কালাম। সহকারী সম্পাদক : ফরহাদুর রহমান, মাফরুহা আক্তার (উর্মি)] লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র, রাজশাহীর ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা (১৯৯৫-) [১বর্ষ ১ সংখ্যা-বৈশাখ আষাঢ়, ১৪০২]

লেখক ও বিষয় : বেল্লাল হোসেন (সংজ্ঞা, প্রতিশব্দ); শেখ রজিকুল ইসলাম (সংস্কৃতির স্বরূপ); নূরে আলম সিদ্দিকী (ছড়ার রূপ ও প্রকার); মানিক শামস (প্রবাদ-প্রবচন); মাফরুহা আক্তার উর্মি (রাজশাহীর বিয়ের গানে আচার); সালেহা খাতুন (রংপুরের ভাওয়াইয়া); ড. মুহম্মদ আবদুল জলিল (ওরাও সঙ্গীত)। পরিশিষ্টঃ সাংগঠনিক প্রতিবেদন।

ঘ. লৌকিক বাংলা

[সম্পাদক : আবদুল হাফিজ, সহযোগী সম্পা. মোমেন চৌধুরী]
[সম্পাদক : (নবপর্যায়) ড. ওয়াকিল আহমদ]
বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদ, ১৯৭৮ নবপর্যায় প্রথম সংখ্যা ১৯৯৭

প্রথম বর্ষ : প্রথম-দ্বিতীয় সংখ্যা পৌষ ১৩৮৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ (জানু-জুন ১৯৭৮)– লেখক ও বিষয় : ড. আশরাফ সিদ্দিকী (মন্ত্র)- আবদুস সাত্তার (আদিবাসী সংস্কৃতি)- মোস্তফা জামান আব্বাসী (লোকসঙ্গীত)-সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (সঙ্গীতশিল্পী আব্বাসউদ্দিন)- আলি নওয়াজ, রঞ্জিতকুমার রায়. ড. বি. রামা রাজু (খনা-ডাক-ঘাঘের বচন ও তেলেগু প্রবাদ)- এস. এম, লুৎফর রহমান (লালন ও রবীন্দ্রনাথ)- সাইফুদ্দীন চৌধুরী (অষ্ট্রাল সংস্কৃতির লৌকিক উপাদান)- আবদুল হাফিজ (আইভরি শিল্প)।

মূল্যায়ন : সেলিনা হোসেন (শাসন সোহাগ)-বদিউজ্জামান(লোকসাহিত্য)- বশীর আল হেলাল (লোক সংস্কৃতি-কোষ)।
বাংলাদেশ ফোকলোর পরিষদের প্রতিবেদন (জুন ১৯৭৬-জুন ১৯৭৮)

ঙ. *লালন পরিষদ পত্রিকা*

সম্পাদক ঃ মুনশী আবদুল মান্নান, লালন পরিষদ, আজিমপুর, ঢাকা।
লেখক ও বিষয় ঃ খোন্দকার রফিউদ্দিন-মুহম্মদ আবূ তালিব-অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-খোন্দকার রিয়াজুল হক-আশরাফ সিদ্দিকী (বাড়ির কাছে আরশীনগর)- মুনশী আবদুল মান্নান-সামীয়ুল ইসলাম-ফজলুর রহমান-বেগম জাহান আরা-মুহম্মদ আবূ তালিব সংকলিত লালন বর্ষপঞ্জি-খোন্দকার রিয়াজুল হক (লালন গবেষণা)।

চ. *ফোকলোর* (সম্পা. প্রফেসর মযহারুল ইসলাম, সহযাগী সম্পা. হেলাল হামিদুর রহমান বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটির ষান্মাসিক। প্রতিষ্ঠা, রাজশাহী ডিসেম্বর ১৯৮৪ প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জানু-জুন ১৯৯৮

লেখক ও বিষয় ঃ প্রফেসর মযহারুল ইসলাম (ভেরিয়ান এলউইন)- দুলাল চৌধুরী (মানবতাবাদে লোকসংস্কৃতি)- বরুণ কুমার চক্রবর্তী (গীতিকায় মানবতাবাদ)-মানস মজুমদার (প্রবাদে বিশ্বপ্রেম)-মুহম্মদ আবদুল জলিল (ফোকলোর গবেষণা পত্রিকা)- যতীন সরকার (জাদু বিশ্বাস)- শীলা বসাক (ব্রতপার্বন)-মোমেন চৌধুরী (কুদৃষ্টি)-অমৃতলাল বালা (পদ্মাবতীর লোক উপাদান)-জিনাত মাহরুখ বানু (দারু শিল্প) চৌধুরী হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী (সর্বমানবিক মৈত্রীবন্ধন)

[সংযোজন ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ হিসাবে 'ফোকলোর' প্রতিষ্ঠার (ডিসেম্বর ১৯৯৮) আগেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. আবদুল খালেক-এর উৎসাহে 'বাংলাদেশ ফোকলোর সোসাইটি', রাজশাহীর প্রতিষ্ঠা ঘটে ১৯৮৪তে। এই সোসাইটির কার্যক্রম শুরু হয় অধ্যাপক মনসুর উদদীনের সংবর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজনের মধ্য দিয়ে (১৮/১২/১৯৮৪)। কিন্তু পত্রিকার মুখপত্রটি ('ফোকলোর') প্রকাশিত হয় ১৯৯৮-এর প্রথমার্ধে। দ্বিতীয় সংখ্যা (জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৮) ড. মযহারুল ইসলামের ৭০ বৎসর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। সংখ্যাটি উভয় বাংলার লোকতাত্ত্বিক ও গবেষকদের রচনায় সমৃদ্ধ। পত্রিকাটি দুই বাংলার লেখা ও আন্তর্জাতিক জগতের তথ্য এবং সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য ও নৃতত্ত্ব প্রভৃতি আন্তঃবিদ্যক বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় সমৃদ্ধ একটি বিশিষ্ট প্রকাশনা।]

ছ. *ব্রাত্য*

[সম্পাদকঃ মোস্তফা তরিকুল আহসান, সহকারী উদয়শঙ্কর বিশ্বাস ও মানিক হাসান]
ফোকলোর চর্চা কেন্দ্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়-এর ফোকলোর বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা।
প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩, জুন ২০০৬

লেখক ও বিষয় ঃ মো. আবদুললাহ-আল মামুন (রংপুরের বাঁশের ছাদ)ঃ অনুপম হীরা মণ্ডল (রাজশাহী মৃৎশিল্প); পূরবী সরকার (শিল্প-জীবিকায় নারী); কে এম জাহিদুল জাহিদ (নাটোরের ঝাঁকা শিল্প); রজতকান্তি রায় তাপস (পুটিয়ার রাজবাড়ির টেরাকোটা মটিফ); উদয়শঙ্কর বিশ্বাস (সাঁতালদের আলপনা); রাখীমণ্ডল (নওগাঁর শোলাশিল্প); মো. সাইফুল ইসলাম (রাজশাহী পিঠা), ফারজানা রহমান (শাজাদপুরের বান শিল্প) মানিক হাসান (রাজশাহীর চলমান শিল্প রিকসা) নাহিদা ইয়াসমিন সুর্বণা (চাপাই-নবাবগঞ্জের সুজনি-কাঁথা শিল্প), ভাস্কররঞ্জন সরকার (রাজশাহীর বাদ্য শিল্প); Saifuddin Chowdhury (Folk art of Bangladesh).

তথ্য সূত্র :

আনা ব্রজজৌস্কা-ক্রাজকা ও মারিয়া কুরি (১৯৯৯)-Polish Folklore Studies at the End of the Twentieth Century; *SEEFA Journal* (Vol. 4, no.1)) Spring.

মনিরুজ্জামান (২০০২)- *লোক সাহিত্যের ভিতর ও বাহির*। ঢাকা। প্রথম সংস্করণ ২০০০।

মহেন্দ্র কুমার মিশ্র (২০০৮) *Contemporary Folklore : From Academic Domain to Public Sphere;* (from Internet source).

লরি হোংকো (১৯৮৪)-সমালোচনা : *Theory and History of Folklore* (Vladimir Propp) Tr. by Ariadna Y. Martin & Richard P. Martin in *Theory and History of Literature* Vol.5 (Ed. A. Liberman). Minnesota.